দর্পণ

সন্তোষ ঢালী

দর্পণ

সন্তোষ ঢালী

গ্রন্থ কুটির

সন্তোষ ঢালী
মা: শ্রীমতীদেবী ঢালী
বাবা: নিত্যানন্দ ঢালী
জন্ম: পয়লা বসন্ত ১৩৭০, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪ ।
জন্মস্থান: পুকুরিয়া, কদমবাড়ি, রাজৈর, মাদারীপুর।
শিক্ষা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে
বি.এ.(অনার্স), এম.এ, বি.এড, এম.ফিল, পিএইচ.ডি।
সংগীত: বুলবুল ললিতকলা একাডেমি থেকে
উচ্চাঙ্গ সংগীতে সার্টিফিকেট কোর্স উত্তীর্ণ।
শখ: গিটার বাজানো, গান করা, আবৃত্তি করা।
তালিকাভুক্ত শিল্পী: বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা ও
বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা।
তালিকাভুক্ত গীতিকার: বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
পেশা: অধ্যাপনা। বি.সি.এস.(শিক্ষা)।
কর্মস্থল: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ;
সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর।
পুরস্কার: একুশের সাহিত্য পুরস্কার, মুক্তধারা ১৯৯০,
সুনীল সাহিত্য পুরস্কার, মাদারীপুর ২০০৯,
অনুভব সম্মাননা, ঢাকা ২০১৩,
বিন্দু বিসর্গ সম্মাননা, গাইবান্ধা ২০১৬।
প্রকাশিত বই:
কবিতা: ফসিল, প্রপার জন্য পঙ্‌ক্তিমালা,
একলব্যের তীর, ভুবনডাঙা, আকাল।
গল্প: অন্তরঙ্গ দ্বৈরথে, নিলামবালা, ছাই, দর্পণ, ৭১।
উপন্যাস: মন না মতি, অচেনা মানুষ।
পাঠ্য: ব্যাবহারিক বাংলা (ব্যাকরণ)।
অভিপ্রায়: ফিরে চল মাটির টানে।

দর্পণ সম্পর্কে

দর্পণ সন্তোষ ঢালীর চতুর্থ গল্পগ্রন্থ। এতে পনেরটি ছোটগল্প স্থান পেয়েছে। গল্পগুলো সাম্প্রতিক সময়ের লেখা। চারপাশের জীবন; জীবনের যন্ত্রণা, সুখ, দুঃখ, লোভ, লালসা, শঠতা, রিরংসা, প্রেম, বিরহ, ভালোবাসা, ঈর্ষা, স্বার্থ, রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি সন্তোষ ঢালীর গল্পের বিষয়। জীবন ছেঁকে আনা কাহিনি তাঁর গল্পের উপজীব্য। কয়েকটি গল্প রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা। স্বাধীনতা সংগ্রামের ভয়াবহ বর্ণনা রয়েছে এ সব কাহিনিতে। বাংলার এবং বাঙালির সীমাহীন দুর্গতি ও দুর্দশার চিত্র রয়েছে এ সব গল্পে। সময় যেন কথা বলে গল্পের ভেতর দিয়ে।

চরিত্রগুলোর বেশির ভাগই সহজ-সরল, সাদামাটা, সাধারণ মানুষ। খেটে-খাওয়া মানুষ। কত অল্পেই মানুষ তুষ্ট হয়, আবার কত অল্পেই হয় রুষ্ট– এ সব ঘটনা তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় হয়েছে জীবন্ত ও বাস্তবানুগ। বর্ণনার গুণে সামন্য, তুচ্ছ ঘটনা বা বিষয়ও হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ। গল্পগুলো বর্ণনা-প্রধান নয়, ইঙ্গিতময়। গল্পের চরিত্ররা যেন চির-চেনা, আপনজন। সব মিলিয়ে গল্পগুলো সুখপাঠ্য। সন্তোষ ঢালীর অন্যান্য গল্পগ্রন্থের মতো **'দর্পণ'**ও পাঠকপ্রিয়তা পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

– প্রকাশক

দর্পণ
সন্তোষ ঢালী

প্রকাশকাল	:	বইমেলা, ২০১৭
প্রকাশক	:	রতন চন্দ্র পাল গ্রন্থ কুটির ২৬, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
গ্রন্থস্বত্ব	:	সংহিতা ঢালী খেয়া
প্রচ্ছদ	:	ধ্রুব এষ
বর্ণবিন্যাস	:	সুপ্তি কম্পিউটার সিস্টেম এন্ড গ্রাফিক্স
মুদ্রণ	:	দিকদর্শন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
পরিবেশক	:	দিকদর্শন প্রকাশনী লিঃ, ২৬ বাংলাবাজার, আলীরেজা মার্কেট (২য় তলা), ঢাকা ১১০০ ফোন : ৭১১৫৬১৮, ০১৭১২-১১৯৩১৮।
মূল্য	:	২০০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN: 978-9849281764

সূচি

আধুলি	০৮
হরিণা	১১
৭১	১৫
বৌদি	১৯
দড়ির প্রান্তে জ্বলে আগুন	২৫
দর্পণ	২৮
লাশের নদী	৩২
খুনি	৩৭
রাজাকার	৪১
মিনার	৪৭
লতিফ চাচা	৫৩
এনগেজমেন্ট	৫৮
সিডর	৬১
সোনাঝুরির সন্ধ্যা	৬৪
ট্যাক্সি-ড্রাইভার	৬৯

তমালী মণ্ডল
সজীব বিশ্বাস

প্রাণে থাক স্নিগ্ধ হাসি আজীবন

আধুলি

পয়সাটা পড়ল, কিন্তু ঠুন্ করে কোনো শব্দ হলো না। কারণ, ওটা কোনো ভিক্ষুকের থালায় পড়ে নি। দু'টো থালার মাঝখানে নো-ম্যান্স ল্যান্ডে পড়েছে। বালির মধ্যে। ওখানে পড়ায় তা ধুলোর মধ্যে নাক উঁচিয়ে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। গা ঢাকা দেয়ার কারণ সীমান্তরক্ষী। দু'দিকের দুই ভিক্ষুকের হস্তক্ষেপ। যে কেউ লুফে নিতে পারে। তাই লুকিয়ে থাকা। পাসপোর্টবিহীন নাগরিকের মতো সীমান্তরক্ষীর হাত থেকে আত্মগোপন। পথিক ছুঁড়ে মেরে দিয়ে চলে গেছে। তার দায় শেষ। কিন্তু একটা সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে ওতে। প্রশ্নটা এই– পয়সাটা কার? গরিব উল্লাহর নাকি ফকির উল্লাহর? গরিব উল্লাহ ভাবছে, পয়সাটা তাকে দিয়েছে। ফকির উল্লাহ ভাবছে, ওটা তাকেই দিয়েছে। দু'জনেরই ধারণা ওটা তার হক পাওনা। পয়সাটা একটা দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটায়।

ওটা একটা আধুলি। চকচকে। একদিকে শাপলা ফুল। অন্যদিকে আনারস, কলা, মুরগি ও ইলিশ। মাছ, মাংস, ফল, সব্জি– সবই আছে পয়সাটার মধ্যে। তাই ওটার গুরুত্ব অপরিসীম। এই আধুলিটা একটা যুদ্ধের সূচনা করে। অর্থই সকল অনর্থের মূল– এই প্রবাদটা এখানে সত্য প্রমাণিত হয়। আকাশ ফুঁড়ে আধুলিটা পৃথিবীতে পড়ল। দু'টো কঙ্কাল সহসা উঠে দাঁড়ায় এবং একে অন্যকে হঠাৎ আক্রমণ করে বসে। কঙ্কাল দু'টোর মধ্যে ঠক্ঠক্ শব্দ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হয় না; কারণ, দু'জনেরই হাড়ের উপর কিঞ্চিৎ মাংস জড়িয়ে রয়েছে। এতই রুগ্ণ, দুর্বল আর শীর্ণ যে প্রবল আক্রোশের আক্রমণ হঠাৎ কোলাকুলিতে পরিণত হয়। যে কেউ দেখলে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে ভাববে তারা কোলাকুলি করছে। ঈদের কোলাকুলি। ঈদ মোবাররক। প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতিটা ঠিক উল্টো। তারা মারামারি করছে। মারামারি করছে নো-ম্যান্স ল্যান্ডে পড়ে থাকা আধুলিটার জন্যে। আনারস, কলা, মুরগি, ইলিশ মাছ আর শাপলা ফুলের জন্য। গরিব উল্লাহ ভাবে পয়সাটা তার থালার দিকে ছুঁড়ে মারা হয়েছে। ফকির উল্লাহ ভাবে তার থালার দিকে। যার যার অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা সচেষ্ট। অধিকার সচেতনতায় তারা বেশ সক্রিয়। অতএব, যুদ্ধের কোনো বিকল্প নেই।

কিন্তু সমস্যাটা অন্যখানে। বহুদূর পাড়ি দিয়ে সীমান্তে পৌঁছানো সৈনিকের মতো তাদের সামর্থ্য নিঃশেষিত। দুই পক্ষই ক্ষীণবল। হতবল। এতই যে দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরেই রয়েছে। আর কিছু করছে না। এর বেশি কিছু করার ক্ষমতা তাদের নেই। কারোরই অন্যজনকে চড়-থাপ্পর, কিংবা কিল-ঘুসি মারার সামর্থ্য নেই। দু'জনই হাঁপানির রোগী। সারাবেলা খুক্ খুক কাশে। এক কথা বলতে তিনবার দম ফেলে। এটা যে একটা অসুখ বা এর যে চিকিৎসা প্রয়োজন, তা তাদের মাথায় আসে না। পায়খানা পেচ্ছাবের মতো নৈমিত্তিক ব্যাপার মনে হয়। হাঁপিয়ে উঠেছে দু'জনই। দম নিচ্ছে, দম ফেলছে। যেন এই দমই শেষ দম দু'জনের। দীর্ঘ অদর্শনের পর যেন দুই বন্ধুর দেখা, এমনিভাবে তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে। এ কারণে তাদের মধ্যস্থতা করার জন্যও কেউ এগিয়ে আসে না। যুদ্ধ থামাবার চেষ্টাও করে না কেউ। বস্তুত তারা একে অপরের বন্ধু নয়, শত্রু। আগে বন্ধু ছিল। আধুলি ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথেই তারা একে অপরের শত্রু বনে যায়। অথচ তারা দু'জনই শোষিত। দু'জনই বঞ্চিত। দু'জনই একই শ্রেণির।

সামনে দু'টো ভাঙা থালা নিয়ে ফুলতলা বাসস্ট্যান্ডে পাশাপাশি বসে ছিল দু'জন ভিক্ষুক গরিব উল্লাহ আর ফকির উল্লাহ। হাড় জিরজিরে খালি গা। পরনে ছেঁড়া লুঙ্গি। একজন পথচারী একটা আধুলি ছুঁড়ে মেরে চলে যায়। পথিকের ছুঁড়ে মারা আধুলিটা কার উদ্দেশ্যে কেউ জানে না। দু'জনই হুমড়ি খেয়ে পড়ে পয়সাটার উপর। পয়সাটা ডুব মেরেছে বালির তলে। কেউ ছাড়তে রাজি নয় অধিকার। আধুলি ফেলে একে অপরকে ধরে। দাঁড়িয়ে দু'জন দু'জনকে মারার জন্য উদ্ধত হয়। একে অপরকে জাপটে ধরে। এর বেশি কিছু করতে পারে না। দম শেষ হলে ধপাস করে দু'জনই বসে পড়ে। কিন্তু জড়িয়ে ধরেই থাকে। যেন যুদ্ধ শেষ হয় নি। তবে নির্বিকার। ভাবলেশহীন। দুর্ভিক্ষের ভাস্কর্য। পাথর। তাদের শেষ শক্তিবিন্দু যেন খরচ হয়ে গেছে।

পয়সাটা খোঁজারও কোনো শক্তি নেই তাদের। কতকাল এ ভাবে থাকবে নিজেরাও জানে না তা। শত্রুতার আলিঙ্গন তাই প্রগাঢ় হয়।

কাছেই একটা বস্তিতে থাকে গরিব উল্লাহ আর ফকির উল্লাহ। প্রতিবেশী। 'কেবল তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ'। এই ঝগড়া গালাগালি, এই পীরিত গলাগলি। এই শত্রু, এই মিত্র। হাসপাতালে জন্ম ও মৃত্যুর সহাবস্থানের মতো শান্তি ও অশান্তির সহাবস্থান। তাদের একজনের সম্পর্কে বললেই আরেকজন সম্পর্কে বলা হয়ে যায়, কারণ দু'জনের জীবন, জীবিকা, ঘর, সংসার, সন্তান, স্ত্রী– বেঁচে থাকা, একেবারে এক। তিন মেয়ে এক ছেলে এক স্ত্রী। দু'জনেরই বড় মেয়ে সোমত্ত। কাগজ কুড়ায়। টুকরো টাকরা ফুর্তিও কুড়ায়। ফাউ দু'এক পয়সা পেলে আইসক্রিম খায়, ফুসকা খায়। কখনও স্নো-পাউডার-লিপিস্টিক উপহার পায়। বউরা পরের বাসায় ঝি-গিরি করে। চুরির অভ্যেস তাদের নেই। তবে মাঝে মধ্যে আলুটা মুলোটা কলাটা আঁচলের তলে কোঁচরে করে লুকিয়ে নিয়ে আসে। তাতে তেমন কোনো দোষ নেই। সংসারে কিছুটা সাশ্রয় হয়। বাজারের পাশে রাস্তার খাদে বাঁশের খুঁটি চটের বস্তা তাঁবু টাঙিয়ে ঘর। ছায়া হয়। রোদ-বৃষ্টি মানে না। ঝড়-জল-হাওয়া মানে না। চাঁদনি রাতে জোছনা আসে ঘরে। শীতের রাতে হিম হিম হাওয়া। অন্ধকার রাতে অন্ধকার আরও ঘন হয়। রাতে কখনও আলো জ্বলে না এ ঘরে। দরকার হয় না। নিত্য অভাব এবং নৈমিত্তিক কলহ তাদের সংসারের ভূষণ। তবে একবার বিছানায় গা এলিয়ে দিতে পারলেই হলো, ঘুমে কাদা। নিদ্রাদেবীর খুব পছন্দ তাদের। নিশ্চিন্তে ঘুমনোর সুখ তাদের আছে। 'হারাবার কিছু ভয় নেই সর্বহারার'।

রোজ সকালে দু'জন দু'টো ভাঙা থালা হাতে করে ফুলতলা বাসস্ট্যান্ডে আসে। বসে বসে ভিক্ষা করে। গাল-গল্প করে। গরিব উল্লাহ কীভাবে গরিব হলো, ফকির উল্লাহ কীভাবে ফকির হলো– সে সব গল্পও করে। গরিব উল্লাহর দাদার জমিদারি ছিল। জাল দলিল করে গোমস্তা সব হাতিয়ে নিয়েছে। তাদের পথে বসিয়েছে। মামলা-মোকদ্দমা করেও কোনো লাভ হয় নি। সেই থেকে ভিক্ষাই তাদের পেশা। ফকির উল্লাহর বাবার ছিল বিশাল ব্যবসা। আগুন লেগে পুড়ে ছাই। তিন তলা বাড়ি ছিল পদ্মার পাড়ে। নদীর ভাঙনে সব শেষ। সেই থেকে ভিক্ষাই একমাত্র গতি। এ ধরনের মুখরোচক গল্প বলা নিত্যদিনের বিষয়। পরনিন্দা-পরচর্চা থেকে রাজনীতি পর্যন্ত। কোন্ নেতা কেমন, কোন্ মন্ত্রী কী ভুল করেছে, কেন দেশের এ দুরবস্থা– এ সব নিয়ে বিজ্ঞজনের মতো মন্তব্য করা শুনে তাদের সবজান্তা মনে হয়। লেখাপড়া জানে না। তবু পত্রিকার ছেঁড়া পাতা উড়ে এলে চোখের সামনে মেলে ধরে, যেন পড়ছে। বোঝাতে চায় যে লেখাপড়াও জানে। কপালদোষে আজ ভিক্ষা করতে হচ্ছে।

সারাদিন ভিক্ষা করে। আবার সন্ধ্যায় ফিরে যায় ডেরায়। ক্ষিধে পেলে দু'টাকা দিয়ে একটা বন রুটি কিনে খায়, আর রাস্তার পাশের সরকারি টিউবওয়েল থেকে পেট ভরে পানি। দুপুরবেলা গোসল করতে নামে নদীতে। কিনারে থালার মধ্যে পয়সার পুটুলি রেখে তার উপর লুঙ্গি রেখে গামছা পরে নদীতে নামে। দুই তিনটা ডুব দিয়ে উঠে পড়ে। ছেলে বুড়া মেয়েরা কত লোকে গোসল করে নদীতে। কার মনে কী আছে কে জানে? কেউ যদি পয়সার পুটুলি নিয়ে দৌড় মারে? ভিজা গায়ে তীরে ওঠে মেয়েরা। হাবলুর মতো সেদিকে তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে। মেয়েদের গালিও খায় মাঝেমধ্যে। গালি খেয়ে হাসে। গালির মধ্যে যেন সূক্ষ্ম তৃপ্তি আছে। ভিক্ষে করে যা পায় তা দিয়ে চাল, তরকারি, নুন, মরিচ কিনে বাসায় ফেরে। যে দিন একটু বেশি রোজগার হয় সে দিন আড়াইশো গরুর গোশ্ত। একটু পেঁয়াজ-রসুন-আদা। মাছ কদাচিৎ হয়, শেষ বাজারের পচাপ্রায় খলসে-পুঁটি। কখনও কখনও ফাউও জোটে দু'চারটে। রাতে কলাটা মুলোটাও পাওয়া যায় ফাউ। আধুলির একপিঠে যে শাপলা তাও জোটে। অন্যপিঠে যে আনারস, কলা, মুরগি ও ইলিশ– তা কখনও কেনার সামর্থ্য হয় না। কিন্তু দোকানে দরদাম করে। ইলিশ মাছের দাম, রুই-কাৎলা-বোয়ালের দাম। মুরগির দাম। দরদাম করার মধ্যেও একটা আত্মতৃপ্তি আছে।

সেদিন রাতে বাজার থেকে ফেরার পথে তারা দু'জন লক্ষ্য করল ঘুটঘুটে অন্ধকার ভেদ করে আরও দু'টো অন্ধকার বেরুল পাশাপাশি দু'টো খুপ্‌রি থেকে। তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না তারা ক্ষেন্তি আর মেন্তি। দু'জনের দুই বড় মেয়ে। গাটে তাদের এখন টাকা আছে। না থেকে পারেই না। এরকম অন্ধকার থেকে বেরুলে কোঁচরে টাকা থাকে। কিছুটা তফাতে দুই বাপ দুই মেয়ের উপর চড়াও হয়। ফ্যাল্‌ টাকা। মেয়েরা অস্বীকার করে– টাকা নেই তাদের কাছে।

– তাইলে কি ফাউ কাম করলি?

– মিথ্যা কস্‌ ক্যান?

– গোরুর গোশ্‌ত কিনুমনে।

– আদ্ধেক ভাগ দে।

টাকা বেরোয় না। ঘামের টাকা চামেই থাকে। কোনো কোনো দিন এমনি অপয়া যায়। সেদিন নিজেদের ভিক্ষুক বলে মনে হয়। একরাশ দুঃখ কষ্ট হতাশা অভিমান নিয়ে ডেরায় ফেরে। আর অদৃষ্টকে অভিশাপ দেয়।

দু'জন একে অপরের বাহুবদ্ধ। কাছ দিয়ে অন্য একজন যাবার সময় তার পায়ে একটা কী যেন ঠেকল। দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে হাত দিয়ে তুলে দেখল। চকচকে একটা আধুলি। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে পকেটে পুরে হাঁটা দিল। সে ভিক্ষুক কিনা বোঝা গেল না। তবে যে লোভী, তা নিশ্চিত। কোলাকুলিরত অবস্থায় ফকির উল্লাহ এবং গরিব উল্লাহ দু'জনেই দেখল এ দৃশ্য। কিছুক্ষণ নির্বাক সে দিকে তাকিয়ে থেকে দু'জন দু'জনার দিকে তাকাল। চোখে-মুখে হতাশা ফুটে উঠল। দু'জনের আলিঙ্গন শিথিল হলো। যেন বজ্র আঁটুনি, ফসকে গেঁড়ো। দু'জনের কলহের সুযোগে পয়সাটা চলে গেল তৃতীয় শক্তির কাছে। হীনবল হতবল দু'জন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যার যার থালার সামনে বসে পড়ল আবার। আবার পথচারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা। কাতরোক্তি করা। দোয়া করা।

নিজেদের কলহের কারণে তৃতীয় ভিক্ষুক নিয়ে গেল আধুলি। সাথে আধুলির গায়ে আঁকা শাপলাফুল, আনারস, কলা, মুরগি ও ইলিশ। ধূসর গোধূলির মৃদু আলো এসে পড়ে আধুলি হারানো দুই ভিক্ষুকের মুখে। একটা উটকো ট্রাক হুড়মুড় করে প্রায় তাদের চাপা দিতে দিতে একগাদা ধুলো উড়িয়ে চলে গেল নাকের উপর দিয়ে। গোধূলির ম্লান আলোটুকুও কেড়ে নিল। এবার ঘরে ফেরার পালা। কিন্তু আজ যেন আর উঠে দাঁড়ানোর শক্তিই নেই তাদের। তবু একে অপরের অবলম্বন হয়ে দু'জন দু'জনকে ধরে উঠে দাঁড়ায়। একে অপরের কাঁধে হাত রেখে ক্লান্ত দেহে ডেরার দিকে পা বাড়ায়, যেখানে জমে আছে গাঢ় এক চির অন্ধকার।

হরিণা

হরিণার কাতর কান্নায় বনরক্ষীর ঘুম ভেঙে যায়। রেঞ্জার শাহ আলম সাহেবকে ডেকে তোলে। রেঞ্জার সাহেব বেরিয়ে দেখেন বাসার সামনে কুয়াশার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হরিণটা কাঁদছে। সন্তানহারানো মায়ের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ঠিক মানুষের মতো। করুণ। বুঝতে দেরি হয় না রেঞ্জার সাহেবের, তার বাচ্চার কিছু হয়েছে। হয় হারিয়েছে, নয়ত খোয়া গেছে। বাঘে নিলে বা বুনো শুয়োরে খেলে করার কিচ্ছু নেই। করার কিছু থাকেও না। খুঁজে দেখা যেতে পারে। এরকম অনেক কান্না শুনতে হয় রেঞ্জার সাহেবদের। মাঝে মধ্যেই। হরিণারা জানে কোথায় কাকে জানাতে হয় তাদের কষ্টের কথা। রেঞ্জার সাহেবরা যে তাদের রক্ষাকর্তা তা তারা জানে। তাই এ কান্নার রোল ওঠে তার দুয়ারে কোনো কোনো রাতে। রাতভর কাঁদতে থাকে সন্তান হারানো মা। হরিণার কান্না বিচলিত করে তাকে। সে রাতে আর ঘুম হয় না শাহ আলম সাহেবের।

শহরে তার বাচ্চার কথা মনে পড়ে। স্ত্রীর কথা মনে হয়। মনে হয় তাদের নিঃসঙ্গ মুখ। কী এক কষ্টের ছটফটানি পেয়ে বসে সারারাত। কত কথা মনে আসে? কত দুশ্চিন্তা দানা বাঁধে? তার বাচ্চাকে যদি না পাওয়া যেত সে কি তাহলে সারারাত ঘরে বসে কাটাতে পারত? কণ্ঠনালী বেয়ে গ্রাস নামত? সম্ভব? পুলিশে খবর দেয়া, বন্ধু-বান্ধবদের জানানো, এখানে সেখানে খুঁজে ফেরা– রাতভর। একই কষ্ট তাড়া করে ফেরে। 'তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে'। হরিণার কান্নাকে তার স্ত্রীর কান্না বলে মনে হয়। সন্তানহারানোর বেদনা পেয়ে বসে তাকে। স্থির থাকতে পারে না। রিভলবারটা গুঁজে নেয় কোমরে। হাতে নেয় হাই পাওয়ারের টর্চলাইট। দু'জন বনরক্ষী নিয়ে বেরিয়ে পড়ে খুঁজতে অত রাতেও।

কটকা বিচ ধরে এগিয়ে যায় যদি কোনো সন্ধান মেলে। অনেক সময় পথ ভুল করে ঝোপে-ঝাড়ে আটকে পড়ে থাকে। ফিরতে পারে না। বাচ্চাও তার মায়ের জন্য কাঁদতে থাকে। অনেক সময় পাওয়া যায় বাচ্চাটাকে। কখনও পাওয়া যায় রক্তাক্ত হাড়গোড় চামড়া। বীভৎস সে দৃশ্য শাহ আলম সাহেবকে পীড়িত করে। সে ক্ষেত্রে হরিণার কষ্ট বন ছাপিয়ে আর্তনাদ তোলে। সে কান্না বড়ই হৃদয়বিদারক। বাচ্চা ফিরে পাওয়ার আনন্দও দেখেছে তারা। সে কী খুশি! আদরে আদরে ভরিয়ে দেয় বাচ্চাকে। বাচ্চাও লাফালাফি জুড়ে দেয়। বনরক্ষী বা রেঞ্জারকে তাদের কোনো ভয় নেই। তারা যেন তাদেরই কেউ। আপনজন। নিভৃত আশ্রয়। তারপর চলে যাবার সময় করুণ চোখে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নেয়। বনের পশুর কেমন মানবিক আচরণ। শাহ আলম বোঝেন বোবা পশুর নীরব ভাষা। মানুষের চেয়েও বেশি মানবিক মনে হয় এইসব প্রাণীকে। হরিণকে পশু বলতে ইচ্ছে হয় না শাহ আলম সাহেবের।

ভয়ঙ্কর সিডর তার সাক্ষ্য রেখে গেছে সুন্দরবনের কটকাতেও। সমুদ্রঝড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে পুরো একটা অঞ্চল। কতগুলো গাছ ভেঙে পড়ে রয়েছে মাঝামাঝি। কতগুলো সমূলে উৎপাটিত। বিপুল বিশাল শেকড় বেরিয়ে রয়েছে। ভয়াল কোনো দানব যেনবা তার ক্রোধের বশে উপড়ে ফেলে রেখে গেছে বিশাল বিশাল গাছগুলোকে। যেন কোনো প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে নদীর কিনারে। কতগুলো গাছ বাজপোড়া। মনে হয় দাবানল হয়েছিল জঙ্গলে। পৌষের রাত। ঘন কুয়াশা। চারদিক সুন্সান। রাতজাগা দু'একটা পাখির ডাক। কখনও শেয়াল বা হিংস্র শ্বাপদের চিৎকার। বাঘের গর্জন। সন্তর্পণে পা ফেলা। বিপদ ওঁৎ পেতে আছে যে কোনো স্থানে। বাঘের ভয়। ভয় বন্য শুকরের। পাইথনের। তবু খোঁজা। তারপর হেতাল বন, লবণ কুঠির পাশ দিয়ে কাঠের ব্রিজ পেরিয়ে তারা খুঁজে এল হরিণ শিশুটিকে। পেল না। ফিরে এল জেটির কাছে। রেঞ্জার সাহেবের বাংলোর কাছে। বুকে না পাওয়ার কষ্ট। হরিণা তখনও কাঁদছে কাতরভাবে।

অন্ধকার মাঝ নদীতে নোঙর করা এম ভি আটলান্টিক। লঞ্চ ভাড়া করে ঢাকা রয়েল কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকগণ এসেছেন সুন্দরবন ভ্রমণ করতে। শিক্ষাসফর ও আনন্দভ্রমণ। প্রতি বছর অন্তত একবার তারা এ সফরের আয়োজন করে থাকেন। উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নৈসর্গের সান্নিধ্য এবং উদ্ভিদ ও জীববৈচিত্র্য

উপলব্ধি করা। দূষণমুক্ত প্রকৃতির মধ্যে কিছুটা সময়ের জন্য হলেও নিজেকে মিলিয়ে দেয়া। নিজকে বিলিয়ে দেয়া। প্রকৃতির পাঠ গ্রহণ করা। কম করে হলেও পাঁচ-ছয়শো যাত্রী এসেছে এবার পৌষে। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি নির্দেশ আছে বন্যপ্রাণীকে উত্যক্ত না করার। শব্দ দূষণ না করার। যেখানে যেখানে চিপ্‌সের প্যাকেট, কোমল পানীয়ের ক্যান, পলিথিন দেখবে কুড়িয়ে এনে ডাস্টবিনে ফেলবে। পরিচ্ছন্ন সুন্দরবন চাই। সে জন্য ছাত্রদের উৎসাহিত করা হয়েছে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সপ্তমাশ্চর্য সুন্দরবনকে জানার বোঝার এবং তার পরিবেশকে সুন্দর রাখার অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হবে। প্রকৃতি ও পরিবেশকে বাঁচাতে হবে।

লঞ্চটা যখন সুন্দরবনে ঢুকল সবার মধ্যে তখন টান টান একটা উত্তেজনা। অধিকাংশের আগমনই প্রথম। বিস্ফারিত চোখে সবাই তাকিয়ে দেখছিল জল আর অরণ্যের গল্প। তখন বিকেল। সুন্দরবনের মাথায় রঙের মায়া বুলিয়ে দিয়ে সমুদ্রজলে মিশে গেল শেষ বিকেলের রবি। আকাশে রঙের খেলা। খোলা আকাশে মনটাও যেন পাখির মতো ডানা মেলে। প্রাণ খুলে গান গায়। অনেকদিনের না বলা কথাটা আত্মপ্রকাশ করল আজ এই উদার আকাশ আর প্রকৃতির সান্নিধ্যে। নাতাশার হাতটা চেপে ধরে ইমতিয়াজ বলেছিল তার ভালোবাসার কথা। নাতাশা বাধা দেয় নি। প্রথম সুন্দরবন দর্শনের মতো প্রথম স্পর্শের সুখ। ইমতিয়াজ বলেছিল–

– ঢাকা ফিরে তোমাকে এমন একটা গিফ্‌ট দেব যা কেউ কাউকে দেয় না। কেউ কখনও দিতে পারে না। বিরল এক অভাবনীয় উপহার।

বিড়বিড় করে কবিতা আওড়ায় ইমতিয়াজ–

– 'ভালোবাসার জন্য দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়। বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি একশো আটটি নীলপদ্ম'।

জানতে ইচ্ছে হয়েছিল কী সেই মহার্ঘ। অনেক অনুনয়-বিনয় করেছিল নাতাশা। ঠোঁটে রহস্য মেখে মৃদু মৃদু হেসেছিল ইমতিয়াজ। বলেছিল–

– এখন বলব না। সময় হলেই জানতে পারবে। তুমি ভাবতেও পারবে না এমন উপহারের কথা।

নাতাশা আর জোর করে নি। টের পেয়েছিল ভালোবাসা গোলাপ হয়ে ফুটেছে বুকের গভীরে। ইমতিয়াজের জন্য তা সযত্নে রেখে দিয়েছে তুলে। সুন্দরবনে না এলে গোপন কথাটা গোপনই থেকে যেত হয়ত। কল্পনার রঙিন সুতোয় আঁকছিল জীবনের নক্সিকাঁথা। মনটা যেন প্রজাপতি হয়ে যায়। জীবন এত সুন্দর হতে পারে, হতে পারে এত আনন্দঘন এর আগে বুঝি টের পায় নি সে।

ছেলেরা লঞ্চের দোতলায়। মেয়েরা তিন তলায়। ছেলেদের যাওয়া নিষিদ্ধ সেখানে। রাত যেন আর কাটতে চায় না। কল্পনার স্বপ্নজাল বোনা চলে সারারাত। সামান্য পরিচয়ের আবেশে মোবাইল নম্বরটাও নেয়া হয় নি দু'জনের। সকালবেলা ঘুম ভাঙে মাইকের ডাকে। জামতলা বিচ-এ যেতে হবে। তড়িঘড়ি তৈরি হয়ে লঞ্চ থেকে নেমে পড়ে। পথেই 'ওয়াচ টাওয়ার'। ইমতিয়াজের সাথে 'ওয়াচ টাওয়ারে' উঠে জঙ্গলটাকে দেখে নাতাশা। বড় সুন্দর। অপূর্ব। কেমন ভয় ভয় করে। পরম নির্ভরতায় শক্ত করে ধরে থাকে ইমতিয়াজের হাত। কোনো কথা হয় না। কথারা যেন পথ হারিয়েছে। কথা যা কিছু মনে মনে। হৃদয়ের স্পন্দন বেয়ে আবেগ সঞ্চালিত হয় প্রাণে প্রাণে। জামতলা সি-বিচ-এ হেঁটে চলা হাত ধরাধরি করে। ইমতিয়াজ গান ধরে– 'চলো না দিঘায় সৈকত ছেড়ে ঝাউবনে পথের ধারে। শুরু হোক পথ চলা, শুরু হোক কথা বলা'। সমুদ্র-গর্জন আর বাতাসের গানে মিশে যায় নাতাশার প্রশ্বাসের শব্দ।

জেটির কাছে এলে রেঞ্জার শাহ আলম সাহেব মাঝ নদীতে নোঙর করা এম ভি আটলান্টিক দেখতে পান। লঞ্চটা যেন বিশাল একটা কুমিরের মতো ঘুমুচ্ছে। কুয়াশার ভেতর তার আলোগুলোকে ঘঁষা ঘঁষা লাগছে। তেমন কোনো শব্দ নেই। তিনি জানেন এটা ঢাকা রয়েল কলেজের লঞ্চ। তাদের দ্বারা কোনো অনিষ্টের চিন্তাও তার মাথায় আসে নি। তবু উপায়ান্তর না দেখে সন্দেহ জাগল। দুষ্ট ছেলেরাও এ কাজ করতে পারে। খুঁজে দেখা উচিত। তাই ট্রলারে করে লঞ্চে এসে হাজির। প্রিন্সিপ্যাল কাসেম সাহেবকে ডেকে বললেন–

– একটা হরিণের বাচ্চা পাওয়া যাচ্ছে না। মা হরিণটা খুব কাঁদছে। এ লঞ্চেই হরিণের বাচ্চাটা আছে বলে আমার বিশ্বাস। বাঘে বা বন্য শুকরে খেলে নমুনা পাওয়া যেত। কোথাও না কোথাও রক্তের সন্ধান মিলত। যতটা সম্ভব আমরা খুঁজে দেখেছি। কোনো সন্ধান পাই নি। আর হরিণাও মাঝে মাঝেই লঞ্চের দিকে তাকিয়ে কাঁদছে। তাই আমাদের মনে হয়েছে এ লঞ্চেই কোথাও বাচ্চাটা থাকতেও পারে। আমরা খুঁজে দেখতে চাই।

সাগ্রহে সম্মতি জানিয়ে কাসেম সাহেবও বাচ্চাটাকে খুঁজতে শুরু করলেন আরও কয়েকজন শিক্ষক নিয়ে। প্রত্যেক কেবিন, প্রতিটি বাথরুম, ছাদ– কোথাও বাদ রাখলেন না খুঁজতে। একে তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন সারা লঞ্চ ঘুরে ঘুরে। কেউ কিচ্ছু বলতে পারছে না। কোনো তথ্য দিতে পারছে না। লঞ্চের সর্বত্র খুঁজেও পাওয়া গেল না বাচ্চাটাকে। হরিণার কান্নার সুর তাকে বিদ্ধ করে। হতাশ হয়ে রেঞ্জার সাহেব চলে যাবেন বলে পা বাড়ালেন। এমন সময় একটা ছেলে এসে বলল–

– স্যার, বিজ্ঞান বিভাগের ইস্‌হাক আর ইমতিয়াজ হরিণের বাচ্চা নিয়ে কী যেন বলাবলি করছিল ফিসফাস করে। কবিরকেও পাশে দেখেছিলাম। আমার মনে হয় ওরা জানতেও পারে।

লঞ্চের ডেকে ছিল তারা। ডাকা হলো তাদের। স্বীকার গেল না। তারা জানালো যে এ বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। রেঞ্জার সাহেবের মনে হলো লঞ্চের খোলের ভিতর পাটাতনের নিচে খোঁজা হয় নি। অমনি টর্চের আলো ফেলে খুঁজতে লাগলেন। এক পর্যায়ে জোনাকির মতো জ্বলে উঠল দু'টো আলো। দু'টো চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল টর্চের আলো পড়ে। নিশ্চিত হলেন ওটি হরিণের বাচ্চা। তুলে আনলেন। দড়ি দিয়ে বাচ্চাটার পা ও মুখ বাঁধা। আসামি ধরা পড়ে গেল। ইস্‌হাক, ইমতিয়াজ আর কবির এ কাজটি করেছে। জানা গেল ঢাকা বসেই তারা প্ল্যান করেছিল হরিণের বাচ্চা চুরি করার। কলার পাতা কেটে নিয়ে এসেছিল ব্যাগে করে। লুকিয়ে।

কটকাতে বিকেলবেলা দলে দলে হরিণ বেরয় নদীর কিনারে জল খেতে। ঘাস খেতে। ওখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে হরিণ দেখা যায় খুব কাছে থেকে। অসংখ্য হরিণ এসে ভিড় জমায় চারপাশে। নির্ভয়ে। কিন্তু শব্দ করা যাবে না। নড়াচড়া করা যাবে না। একটু শব্দ হলেই মুহূর্তে সব উধাও। আবার ভিরু ভিরু পায়ে এসে হাজির। সে এক দেখার মতো দৃশ্য। ধীর পায়ে একেবারে কাছে এসে দাঁড়ায়। হাত বাড়ালে হাত চেটে দেয়। যদিও কোনো খাবার দেয়া নিষিদ্ধ তবু কিছু দিলে খেয়ে নেয়। ইস্‌হাক আর ইমতিয়াজ ছিল চাদর গায়ে। চাদরের তলে ছিল ঢাকা থেকে আনা কচি সবুজ কলার পাতা। সামান্য এগিয়ে দিতেই একটা বাচ্চা হরিণ এসে খেতে শুরু করেছিল। সেই সুযোগে বাচ্চাটার মুখ চেপে ধরে চাদরের তলে লুকিয়ে ফেলে। লঞ্চে এসে সবার অজান্তে লুকিয়ে রাখে পাটাতনের নিচে।

রেঞ্জার সাহেব তিনজনকেই অ্যারেস্ট করলেন। পরদিন চালান করে দেবেন থানায়। পরে কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ছেড়ে দেন। তাদেরকে সবাই তিরস্কার জানায়। ঢাকা ফিরেই কলেজ থেকে ওই তিনজনকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন প্রিন্সিপ্যাল তখনই। রেঞ্জার সাহেব ফিরে আসেন তার বাংলোর সামনে। তখনও কাঁদছিল হরিণা। বাচ্চাটাকে দেখার সাথে সাথে হরিণা কী যে খুশি! একবার বাচ্চাকে আদর করে একবার রেঞ্জার সাহেবের কাছে ছুটে আসে। সে প্রায় পাগলের মতো কাণ্ড। শাহ আলম সাহেবের চোখে জল এসে যায়। তখন বাইরে আলো ফুটেছে। হরিণা তার বাচ্চা নিয়ে চলে যায় আপন ঠিকানায়। তখনই ঢাকায় ফোন করেন তার স্ত্রীকে। খোঁজ নেন তার ছোট্ট সোনামণির। সে এখন মায়ের বুকে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

ততক্ষণে ভোর হয়ে গেছে। কুয়াশা ভেদ করে রুপার থালার মতো বিশাল এক চাঁদ উঠেছে পুব আকাশে। আসলে ওটা চাঁদ নয়, সকালবেলার সূর্য। সূর্য তার কণা কণা আলো ছড়িয়ে ভুবন ভরিয়ে দিয়েছে। জেগে উঠেছে সুন্দরবন আপন মহিমায়। হেসে উঠছে পৃথিবীর সৌন্দর্য বিশ্বের বিস্ময়। নোঙর তোলা হয়ে গেছে। এম ভি আটলান্টিক সাইরেন বাজিয়ে ছেড়ে দিল ঢাকার উদ্দেশ্যে। লঞ্চের ডেকের এক কোণে নতমুখে একা একা দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মেয়ে। চোখে তার জল। একবারও ভাবে নি এমন করে লোনাজলে মিশে যাবে জীবনের প্রথম ভালোবাসা। ফুটেই ঝরে গেল শেষ বিকেলের ফুল। এমন কষ্ট কখনও ছোঁয় নি তাকে। আজ

এই আলোফোটা ভোর, অশ্রুধারা যেন ধুয়ে দিল সকল আবিলতা। 'হরিণারে নিলয় ন জানি'। তীরবিদ্ধ পাখির মতো বিষণ্ন ফিরে যাচ্ছে ইমতিয়াজ। কুয়াশার চাদর মুড়ি দেয়া বনানীর দিকে চেয়ে করুণ সুরে একা একা গাইছে বিদায়বেলার মেয়ে–

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,

আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে।।

ঘুম ভেঙে তখনও জেগে ওঠে নি বনের পশুরা। দু'একটা পাখি যেন সচল হয়ে উঠল। কুয়াশাভেজা গাছের পাতারা যেন বিদায় জানালো– ভালো থেকো জীবন। কাছে এসে পিঠে হাত রেখে দাঁড়াল তার এক বান্ধবী। কোনো কথা নয়। কথা যেন বাহুল্য এখানে। ধীরে ধীরে সেও কণ্ঠ মিলাল তার সাথে–

দেহমনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে,

গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে।।

একটু পরে সেখানে এসে ভিড়ল আরও কয়েকজন বান্ধবী। এরপর আরও কয়েকজন বন্ধু। যে আসে সে-ই কণ্ঠ মিলায় সুরে-বেসুরে। নাতাশা লক্ষ করল তার চারপাশে অসংখ্য বন্ধু এসে জুটে গেছে। সবাই তার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইছে। শত কণ্ঠের কোরাস। বঙ্গোপসাগরের ঢেউ কেটে কেটে সামনের দিকে এগিয়ে চলে এম ভি আটলান্টিক। ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে সে গান অলৌকিক আবেশের সূচনা করে। সবাই মিলে রচনা করে মোহন আলোর মুক্তির ভোর। চোখের জল মুছে নাতাশা আবার শুরু করে–

আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,

দুঃখবিপদ-তুচ্ছ-করা কঠিন কাজে।

বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমের বহ্নিজ্বালা–

জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি-আশে।।

৭১

'এ গ্রামের নাম আগে এ রকম ছিল না। আগে ছিল চালতাবাড়ি। এখন নাম হয়েছে পোড়াগাঁও। বুড়োবুড়িরা বলত এ গ্রামে এক সময় প্রচুর চালতাগাছ ছিল। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যখন ফুল ধরত তখন গোটা গ্রামটাই যেন ফেনিয়ে উঠত। মনে হত সবুজ আকাশে সাদা সাদা মেঘ। চালতার সাদা ফুলের পাপড়িগুলো এতই পাতলা যে মনে হয় সামান্য বাতাসেই ছিঁড়ে যাবে কিংবা ছুঁলেই খসে যাবে। আর পাপড়ি খসে যখন সবুজ সবুজ ফল ধরত তখন কী যে ভালো লাগত। গাছের দিকে তাকালেই জিভে জল এসে যেত। চারদিকে শুধু গাছ আর গাছ। বনময় এক সবুজ গ্রাম। সেই গাছগুলোর বেশিরভাগই হলো চালতাগাছ। তাই বুঝি গ্রামের নাম চালতাবাড়ি। গাবগাছও ছিল বেশ। তবে চালতাগাছের মতো অত নয়। সে এখন স্মৃতি। এ গ্রামের নাম এখন পোড়াগাঁও। পোড়াগাঁও নাম হওয়ার ইতিহাস সবার জানা। এখন আবার সবুজে সবুজ এ গ্রাম। তবু নাম তার পোড়াগাঁও'– এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে দম নিলেন অজিতবাবু।

ওই পোড়াগাঁয়ে বিকাশের শ্বশুরবাড়ি। বিয়ের পর দশদিনের দিন যেতে হয় শ্বশুরবাড়ি। এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে যাওয়া। বেশ খানিকটা মেঠোপথ পেরিয়ে এক জঙ্গলবাড়ি। পাশ দিয়ে বয়ে চলা ছোট্ট একটা খাল। দু'একজন জাল ফেলে মাছ ধরছে। ভেসে থাকা কচুরিতে আলপনা আঁকা গোলাপি-বেগুনি ফুল ধরেছে। দু'পাশে ধানক্ষেত। সবুজে সবুজ। শান্তির বার্তার মতো দূর থেকে ভেসে আসে শীতল বাতাস। সেই মিষ্টি-মধুর বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিতে নিতে স্ত্রী ঝুমু আর শ্যালিকা কুমুকে নিয়ে এক বিকেলে বিকাশ উপস্থিত হয় অজিতবাবুর বাড়ি। বাড়ি তো নয়, প্রকাণ্ড এক বাগান। বিশাল দিঘি। আম-জাম-কাঁঠালের বাগান পেরিয়ে এক দোতলা বাড়ি। পুরনো। ইটগুলো যেন পান খাওয়া দাঁত বের করে উপহাস করে। সাড়া পেয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। বয়স আশি কি নব্বই। দীর্ঘদেহী কিন্তু বয়োভারে ন্যুব্জ। হাঁক ছাড়লেন– কে?

– আমি ঝুমু, দাদু। তোমার নাতজামাই এসেছে তোমাকে দেখতে।

– তাই বলো। এসো এসো। কী নাম? কোথায় থাকো? কী করো?

– আমি বিকাশ। ঢাকায় থাকি। চাকরি করি।

সাথে সাথে বৃদ্ধের কৃত্রিম ক্রোধ জাগল। কথা শেষ না হতেই তিনি শুরু করলেন–

– কেউ যেন কারো ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া না শেখায়। আর যদি শেখায়ও, চাকরি করতে যেন না দেয়। কাকের বাসায় কোকিলের ছানা পালন করে কী লাভ? পাখা গজালেই ফুড়ুত।

– কেন দাদু, সমস্যা কী?

– কেন? এই দ্যাখো না আমাকে? পঁয়ত্রিশ বিঘা জমির উপর এই বাড়ি, বিশাল বাগান, বিশাল দিঘি। অথচ মানুষ বলতে আমি একা। আমার তিন ছেলে। সবাই এম.এ. পাস। সবাই বড় চাকরি করে। বউমারাও চাকরি করে। তারা দূরে দূরে থাকে। বছরে এক-আধবার আসে কি আসে না। আর এই ভূতুড়ে বাড়িতে আমি একলা পড়ে থাকি ভূতের মতো। সাথে থাকে ওই বুড়ো নরেশ। সব থাকতেও আমার কিছুই নেই। ছেলেরা বাবাকে কাছে রাখতে চায়। আমি তিন ভাগ হয়ে কার কাছে কয়দিন থাকব? পিতৃত্বও এখন ভাগাভাগি হয়ে যায়! এর চেয়ে আমার এই মাটিই ভালো। মাটিতেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। রমেশ শীলের একটা গান আছে না– 'মাটির মানুষ মাটি নিয়া সারাদিন কাটাই'। এ মাটিতেই যে আমার সব মিশে আছে। এদের ফেলে আমি কোথায় যাই?

– ঠিকই বলেছেন দাদু। লেখাপড়া একটু শিখলেই সবাই শহরে চলে যায় চাকরির খোঁজে। গ্রামে থাকে না।

– মাটির সাথে সম্পর্ক না থাকলে মানুষ বাঁচে? শিক্ষিত নাগরিকদের এই মাটির সাথেই সম্পর্ক নেই। অথচ এই মাটিই সব। শিকড় ছাড়া গাছ বাঁচে না। আমিও সেই শিকড়ের টানেই কোথাও যাই না।

বিকাশের বুঝতে অসুবিধে হয় না বৃদ্ধের ক্ষোভের কারণ। নগর কেমন গিলে খাচ্ছে স্নেহ-মায়া-মমতা; সবুজ। বৃদ্ধের এ অসহায়ত্বের জন্য বিকাশের কষ্ট হচ্ছিল। তার নিজের বাবা-মা'র কথা মনে পড়ে যায়। তাঁরাও তো নিঃসঙ্গ দিন কাটাচ্ছেন গ্রামে। ভাই-বোন সবাই বিচ্ছিন্ন। সবাই একত্র হয়ে এক সাথে মিলতে পারে না অনেকদিন। বাবা-মাকেও কাছে এনে রাখতে পারে না। ইচ্ছে হলেই তো তাদের শেকড় ছিঁড়ে তুলে আনা যায় না। সে বড় কঠিন বন্ধন। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য গ্রামের কথা জিজ্ঞেস করতেই অজিতবাবু দীর্ঘ এক ফিরিস্তি দিলেন গ্রামের নাম সম্পর্কে।

ঘর থেকে একটা গাছপাকা পেঁপে আর গোটা কয়েক গাছপাকা সফেদা এনে ঝুমুর হাতে দিলেন অজিতবাবু। ঝুমু আর কুমু মিলে সেগুলো ধুয়ে-মুছে-কেটে-কুটে পরিবেশন করল সবাইকে। গাছপাকা এ ফলের স্বাদই আলাদা। এর মধ্যে কোনো ভেজাল নেই। সার নেই, রাসায়নিক পদার্থ নেই। গ্রামের এই সহজ সরল মানুষের মতো সহজাত। জানালা দিয়ে বাইরে চোখ যায় বিকাশের। চোখে পড়ে সফেদা গাছটা। বেশ বড়। পিংপং বলের মতো ধূসর গোলগোল অজস্র সফেদা ডালগুলোকে নুয়ে দিয়েছে। ভারি চমৎকার দেখায়। গাছের ছায়াগুলো দীর্ঘ হয়ে ঢেকে ফেলেছে উঠোন। উঠোনে ডাটা শাখ। সবুজ। পাখিদের কিচিরমিচির মুখরিত করে তোলে বাতাস। ম্রিয়মাণ হয়ে আসে দিনের আলো। ম্লান আলোয় কী অপূর্ব লাগছে সবকিছু। কেমন এক প্রশান্ত বিকেল সব কষ্ট ধুয়ে দেয়। বড় বিস্ময় লাগে বিকাশের। ভাবে– তাই বুঝি কবিগুরু লিখেছিলেন 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি'। বাতাসের কী এক মিষ্টি বুনোগন্ধ বন্ধুর মতো জড়ায়ে ধরে। এক স্বর্গীয় শান্তি নেমে আসে পৃথিবীতে।

অনেকগুলো ছেলেমেয়ের হৈচৈ শুনে বিকাশ বাইরে তাকায়। কচিকচি কতগুলো ছেলে-মেয়ে পৃথিবীর যাবতীয় আনন্দ বুকে নিয়ে উল্লাস করছে। মুখে হাসি। হাতে বই খাতা। পেছনে দিদিমণি স্নিগ্ধতার প্রতীক। অজিতবাবু খেয়াল করলেন বিষয়টা। বললেন–

– করুণা। নরেশের মেয়ে। পাঠশালা চালায়। সকালে আসে। আশেপাশের কতগুলো ছেলেপিলে নিয়ে সারাদিন কাটায়। পড়ালেখা থেকে শুরু করে নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয় এসব চলে। মাঝে মধ্যে বাগানে ঘুরে বেড়ায়। বিকেলে সবার ছুটি হলে যে যার বাড়ি চলে যায়। দুপুরে করুণাই বাচ্চাদের রান্না-বান্না করে খাওয়ায়। ভূতুড়ে বাড়িতে ওরাই যা প্রাণের স্পন্দন। আমারও সময়টা কেটে যায়।

করুণাকে দেখে করুণা না হবার কোনো কারণ নেই। পলকেই বিকাশ করুণাকে পাঠ করে ফেলে আপাদমস্তক। সাদা শাড়িতে আবৃত এক জীবন্ত দেবীমূর্তি যেন। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। পবিত্র হাসিমাখা মুখ। করুণ ডাঙার মতো সিঁথি। সেখানে লালের কোনো রেখা নেই। হাত শাঁখা-শূন্য। বিকাশের মুখে কথা সরে না কিছুক্ষণ। বিকাশের স্ত্রী ঝুমু বলে–

– জানো, আমিও মাঝে-মধ্যে পড়েছি করুণা পিসির কাছে। পিসি কী যে ভালো। পিসি এত সুন্দর রান্না করে, অথচ নিজে মাছ-মাংস-ডিম কিছুই খায় না। সারাক্ষণ মুখে হাসি লেগেই আছে, অথচ মুখ ফুটে একটা কথাও বলে না। অনেক দুঃখ পিসির। মনের দুঃখ মনেই পুষে রাখে। কেউ তার তল পায় না।

– করুণাই তো দু'বেলা দু'মুঠো রান্না করে দিয়ে যায় আমাকে। ওর হাতের রান্না যেন অমৃত। কিন্তু মেয়েটাকে দেখলে বড় কষ্ট হয়। একাত্তর আমাদের অনেক ক্ষতি করে দিয়ে গেছে। বুক জুড়ে দিয়ে গেছে রাশি রাশি বিষাদ। বিয়ের এক মাসের মাথায় জামাইবাবা মুক্তিযুদ্ধে গেল। আর ফিরে এল না। কোনো খবরও পাওয়া গেল না আর। বেঁচে আছে, কি মরে গেছে, কেউ জানে না। কোনো ছেলেপুলেও হয় নি। শ্বশুরটা চামার। করুণাকে পাঠিয়ে দিল বাপের কাছে। সেই থেকে করুণা এখানেই। একটা পাঠশালা খুলে ওকে অনেকগুলো ছেলেপিলের দায়িত্ব দিয়ে দিলাম। কষ্টটা অন্তত ভুলে থাকতে পারে কিছুক্ষণের জন্য হলেও।

সন্ধে হয় হয়। বিকাশ উঠে দাঁড়ায় ফেরার জন্য। পেছনে অজিতবাবু চললেন। সাথে বৃদ্ধ নরেশ। অজিতবাবুকে বিষণ্ন লাগছিল। শ্লথ গতি। পায়ে বাঁধা পাথর। যেন বিশাল এক মহীরুহ ঝড়ে ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় কাল গুনছেন। মনে হচ্ছিল গভীরভাবে কিছু একটা খুঁজছেন তিনি অতীতের কৃষ্ণ-গহ্বরে। হাতড়ে পাচ্ছেন না। বললেন–

– চলো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।

বাড়ির পশ্চিমদিকে যেখানে নিয়ে গেলেন, সেখানে অসংখ্য গাছ-পালার ঘন জঙ্গলের ওপাশে সূর্য ডোবার খেলা। রক্তের মতো গাঢ় লাল। সিঁদুরের মতো করুণ। করুণার সিঁথির সিঁদুরের মতো একটু পরেই মুছে যাবে সবটুকু রঙ। অন্ধকার চেটে নেবে ঘন সবুজ। সেই ঘন সবুজের মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল দু'টো গাছ। গাব গাছ। অজিতবাবু জানালেন। ওখানে এসেই আটকে গেল তাঁর পা। কোনো পাতা নেই। প্রাণ নেই। শুধু মরা ডাল। পোড়া। রিক্ততার কঠোর উদাহরণ। কষ্টিপাথরের মতো কালো। যেন কালের সাক্ষী। গাঢ় সবুজের মধ্যে কেমন বেমানান। ভৌতিক মনে হয়। হঠাৎ দেখলে গা ছমছম করে ওঠে। প্রেতপুরীতে বিশাল দু'টো প্রেতের কঙ্কালের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে অনাদি অনন্তকাল ধ'রে। গাছ দু'টো যেন কীসের ইঙ্গিত দেয়।

বিকাশের হঠাৎ মনে হলো গাছ দু'টোর আকৃতির মধ্যে এক ভয়ঙ্কর সত্যতা আছে। ডাল এবং গাছের আকৃতি মিলে বাঁ দিকের গাছটা দেখতে কিছুটা বাংলা 'সাত' এর মতো। আর ডান দিকের গাছটা যেন বাংলা 'এক' এর মতো। সহজে অবশ্য তা বোঝা যায় না। ছোটছোট ডালগুলো বাদ দিয়ে একটু কায়দা করে দেখলে ছবিটা ভেসে ওঠে। বিমূর্ত ছবির মতো একটু চিন্তা করলেই অক্ষর দু'টো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুহূর্তে বিকাশ এক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। বলে উঠল–

– গাছ দু'টো দেখে মনে হয় যেন বিশাল কালো অক্ষরে লেখা '৭১'।

পেছনে ডুবন্ত সূর্যের রক্তিম আভা তাকে আরও চিত্রময় করে তুলেছে। আরও রহস্যময় করে তুলেছে। এ এক সুনিপুণ কারুকাজ। মনে হয় বিশ্বশিল্পীর নিজ হাতে তৈরি প্রাকৃতিক শিল্পকর্ম। এ যেন একাত্তরের নির্মম ভাস্কর্য।

– ঠিক ধরেছো নাতজামই। এ গাছ দু'টো কত লোকে কিনতে চেয়েছে, আমি সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছি। বলেছি– ওই স্মৃতিটা আমাকে পোড়ানোর জন্যে থাক। গাছ দু'টো আর আমি একই বয়সী। ওরাও পুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যন্ত্রণার স্মৃতি নিয়ে। আমিও পুড়ছি। আমিও সে আগুন পুষে রেখেছি বুকে আজ আটত্রিশ বছর। ওরা আমাকে টানে। যেখানেই থাকি, কখন যেন এখানে এসে পৌঁছে যাই।

বৃদ্ধের চোখে স্মৃতিকাতর জল আবিষ্কার করে বিকাশ। পা দু'টো অনড়। ঠোঁট দু'টো থরথর কাঁপছে। কথা ফোটে না মুখে। বুকের জমানো বাষ্প ঠেলে বৃদ্ধ বলে ওঠেন–

– সবিতা আর কবিতা আমার দুই মেয়ে। কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী সবিতা। আর কবিতা ক্লাস টেন-এ। আর তিন ভাই অশোক, অরূপ, অপূর্ব বেশ ছোট। অশোক কেবল প্রাইমারি ডিঙিয়ে হাইস্কুলে। একাত্তরের শুরুর কথা বলছি।

একটু থেমে চোখ মুছে আবার বলছেন–

– গঞ্জ থেকে বেশ দূরে এ জায়গা। গণ্ডগ্রাম বলে মোটামুটি নিরাপদ। ভেবেছিলাম মিলিটারি আসবে না এ গ্রামে। সব ভাবনাই কি সত্যি হয়? যা হবার, হলো। পালাবার পথ পেলাম না আমরা। আমাদের মারল না, পোড়াল না। শুধু লুট করে নিয়ে গেল যা ছিল সব। টাকা-পয়সা, সোনা-দানা, মান-সম্ভ্রম সব।

একটু নীরবতা। গুমোট এক ভারি বাতাস কণ্ঠনালী চেপে ধরে। নরেশবাবু বলেন–

– তখন এ গাব গাছ দু'টো এ রকম পোড়া ছিল না। ঘন সবুজ ছিল। কী ছায়া ছিল তার। কত গাব ধরত এ গাছ দু'টোতে। সবুজের মধ্যে থোকা থোকা হলুদ; পাকা গাব। ছেলেপেলেরা পেড়ে পেড়ে খেত।

– সহ্য করতে পারছিলাম না এ যন্ত্রণা। শুধুই কেঁদেছি। সারাদিন ঘর থেকে বেরোয় নি দুই বোন। পাথর যেন। নির্বিকার। দু'চোখে দুই জলের ধারা শুধু। বিকেলে খুঁজে পাওয়া গেল না ওদের। সন্ধের সময় আবিষ্কার করলাম– সবিতা আর কবিতা দুই গাব গাছে দুইজন ঝুলে আছে। সে দৃশ্য ঈশ্বরের পক্ষেও বুঝি সহ্য করা কঠিন।

– নামানো হলো। নিথর দু'টো দেহ। হিমশীতল। সারা গ্রাম ভেঙে পড়ল কান্নায়। দুই গাছের গোড়াতেই দুইজনের চিতা জ্বলল। একই সাথে। একই সাথে ছাই হলো দু'টো সম্ভাবনা।

– এই হাতে মুখাগ্নি করেছি। এই হাতে। দ্যাখো, করতলে এখনও লেগে আছে লাল আগুন।

– এমন করুণ দৃশ্য কেউ কখনও দেখে নি।

– পরদিন আবার এল মিলিটারি। সবিতা আর কবিতাই যেন উদ্দীষ্ট। তাদের খুঁজে না পেয়ে বাড়িতে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল। আমরা পালিয়ে বাঁচলাম। কিন্তু ওই গাব গাছ দু'টো পালাতে পারে নি। ওরা দাঁড়িয়ে ছিল নির্ভয়ে। তাদের ক্রোধ পুড়িয়ে দিল সবুজ। এই দালান-কোঠা, গাছ-গাছালি সব। একটুকুও সবুজ বেঁচে ছিল না এই বাড়িতে। সব পুড়ে ছাই। এই পোড়া গাব গাছ দু'টো আমার সেই যন্ত্রণার সাক্ষী। ওরাই আমাকে বেঁধে রেখেছে এই প্রেতপুরীতে। এক পা নড়তে দেয় না। ওদের রেখে আমি কী করে কোথাও যাই?

পাড়ভাঙা নদীর মতো ঝুপঝুপ ভেঙে পড়েন অজিতবাবু কালস্রোতে। হিসেব মেলাতে পারে না বিকাশ, অজিতবাবু বিজিত না পরাজিত। কেবলই মনে হয় এ রকম লক্ষ অজিত ছড়িয়ে রয়েছে সারা বাংলায়। বিকাশ নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে অভিশপ্ত কালো দু'টো অক্ষরের দিকে। বাংলা 'সাত' এর পিঠে বাংলা 'এক'। কালো ৭১। ৭১ এর কঙ্কাল। সূর্য ডুবে গেছে। ঘন সবুজও চলে গেছে অন্ধকারের কালোর অধিকারে। বিকাশ দেখতে পায় সামনে বিশাল কালো প্রেতাত্মার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে একাত্তর। এক মর্মন্তুদ স্মৃতিস্তম্ভ। গাঢ় কালো এক ইতিহাস। ধীরে ধীরে গাঢ় কালো অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে, মিশে যেতে থাকে কালো ৭১।

আর দেখতে পায়, ধূসর প্রকৃতির বুক চিরে সন্ধ্যার মতো সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে ধীর পায়ে সেদিকে এগিয়ে আসছে কে একজন। একা। করুণা। সর্বংসহা মহাকাল। কালো ৭১ এর পায়ে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতে। বিকাশের কী হয়– সে দেখে– শত শত করুণা সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে এগিয়ে আসছে কালো অক্ষর দু'টোর দিকে। শত শত নয়, হাজার হাজার। লক্ষ লক্ষ। সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে অগণিত সাদা শাড়ির মিছিল। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। মাথাটা টলে। আগুনের মেলা। সকল প্রদীপ মিলে যেন এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ঘটায়। দাবানলের সৃষ্টি করে। পোড়া ৭১ কি আবার পুড়বে?

বৌদি

(কাননবালা ঠাকুর, বাংলার চিরায়ত এক বৌদির মুখ)

পূজনীয়া বৌদি,

শেষ নমস্কার তোমাকে। তুমি করেই বলছি আজ, আগে অবশ্য আপনি করে বলতাম। কেমন আছো– এ প্রশ্নও আর করছি না। প্রশ্ন করাটা নিরর্থক। যে প্রশ্নের কোনো উত্তর থাকে না, সে প্রশ্ন অহেতুক। আমি ভাবছি, এ কেমন অকৃতজ্ঞ দেবর আমি, যে এত এতকাল পরে তোমাকে লিখছি? কম করে হলেও দশ বছর? ব্রহ্মাণ্ডের মাপে এ আর কী এমন? কিন্তু মানুষের আয়ুর মাপে এ কম নয় নিতান্ত। দশটা বছর! 'তারপর দশবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করেছে পৃথিবী . . . যে সন্তানেরা জননীর গর্ভে ছিল, আজ তারা দশ বছরের বালক'। যারা কিশোরী ছিল, আজ তারা কারো জননী। যে বৌদি হা-পিত্যেস করে বসে থাকত আমার চিঠির প্রত্যাশায়, চিঠি না পেলে কি তার প্রাণ ভরে? সামান্য একটা চিঠি। সাদা এক টুক্‌রো কাগজের বুকে কিছু কালির আলপনা। তাও লেখার সময় হয় নি আমার? চিঠি লেখার যুগ কি তবে শেষ হয়ে গেছে? চোখের আড়াল হলে কি মনের আড়ালও হয়? হয়ত সামান্য নয়। ওই কালির দাগের মধ্যেই হয়ত স্থায়ী হয়ে রয়ে যায় হৃদয়ের রক্তক্ষরণ। আজ তাই লিখতে বসা। তোমাকে।

সবাই যে নামে ডাকে, সে নামে তুমি ডাকতে না আমাকে। তুমি একটা নাম দিয়েছিলে আমার। মিঠুন। ও নামের মধ্যে কী যে পেয়েছিলে তুমি, জানি না। দেখতেও আমি মিঠুন চক্রবর্তীর মতো নই। খ্যাংড়াকাঠি। কাজে-কর্মেতো নই-ই। কেন যে ওনামে তুমি আমাকে ডাকতে, আজও জানা হয় নি। মনে পড়ে বৌদি, তুমি আমাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলে? এক বিকেলে। মছলন্দপুর। মুক্তি সিনেমা হল। 'ডিসকো ড্যান্সার'। শো শেষ করে তুমি আমাকে ফুস্‌কা খাইয়েছিলে। সেদিনই প্রথম খেয়েছিলাম ফুস্‌কা। সে কী ঝাল! চোখের জলে নাকের জলে একাকার। রাত সাড়ে ন'টার ট্রেনে বাড়ি ফেরা। স্টেশন থেকে নেমে বেশ খানিকটা পথ পায়ে হেঁটে। কাঁচা রাস্তা। শুক্লপক্ষের কিশোরী চাঁদ সবে ডুবে গেছে। এক জায়গায় পথের দু'ধারে ঘন বাঁশবন কিছুটা পথ। আদিম গুহার মতো গাঢ় অন্ধকার। আমার গা ছম্‌ছম্‌ করছিল ভয়ে। আমি তোমার হাত চেপে ধরেছিলাম। তুমি আমাকে বুকে জড়িয়ে আঁচলে ঢেকে বলেছিলে, 'ওরে আমার ভীতু মিঠুন'! সেদিন থেকেই তুমি আমাকে মিঠুন বলে ডাকতে শুরু করলে। এ নিয়ে আমার অবশ্য কোনো অভিযোগ নেই। ছিলও না কখনও। বরং ভালোই লাগত। কোনো একজন আমাকে অন্তত আদর করে নিজস্ব একটা নামে ডাকে। যে নামে আর কেউ ডাকে না। আর কখনও আঁচলে ঢেকে রাখবে না আমাকে? সেই গা ছমছম করা বাঁশবন, পরম নির্ভরতার বুকের ওম এখনও আমাকে নাবালক করে রাখে।

মনে আছে বৌদি, শেষ যেবার তোমার কাছ থেকে চলে আসি, সে বারের কথা? বিজয়া দশমীর পরের দিন। সকালবেলা। সবে রোদ উঠেছে। মিষ্টি রোদ। ঘাসে ঘাসে চিক্‌চিক্‌ শিশির। বাতাসে শরতের ঘ্রাণ। উঠোনে ঝরেপড়া মৃত শেফালির মিনতি। আমি রিক্সার পাশে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলে– 'আবার কবে আসবে ঠাকুরপো? আমার খুব খারাপ লাগবে'। আর কোনো কথা নয়। বেশি কথা বাহুল্য যেন। ওই দু'টো বাক্যের মধ্যে ধরা রইল জগতের সমস্ত নর-নারীর বিদায়ের ক্ষণ গভীর মমতায়। তোমার গলা ধরে এল। খালি পা। লাল ডুরে শাড়ি। ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে থাকলে পথের পাশে। আমারও কষ্ট হচ্ছিল খুব। বলেছিলাম, 'বৌদি, চোখের জলে পথটা পিচ্ছিল করে দেবেন না'। তাই হলো। বেশ কয়েক বছর আর যাওয়াই হলো না তোমার ওখানে। চাকরি হলো। নতুন চাকরি। ব্যস্ততা। ছুটি। পাসপোর্ট, ভিসা। হরতাল, ধর্মঘট। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পারমিশনের ঝক্কি। আর যাওয়া হলো না বেশ কয়েক বছর। দেখাও হলো না। কী করে যেন চিঠিও লেখা হয়ে ওঠে নি আর।

সকাল সাতটার ট্রেন ধরার জন্য তড়িঘড়ি নাকেমুখে দু'টো খেয়ে দৌড়। রিক্সা একটা দাঁড় করানো ছিল আগে থেকেই। রিক্সায় এক পা তুলেছি সবে, তখন মনে পড়েছে তোমার– আলুভাজা খাওয়া হয় নি। ভুলে গেছ দিতে। সে কী তোমার মন খারাপ! আমি বললাম, এর পরে যে বার আসব, সে বার আলুভাজা বেশি করে খাব। দোহাই বৌদি মন খারাপ করবেন না। ছলছল চোখে দাঁড়িয়েই থাকলে। দু'পাশে কাশফুলের সাদা পাথার পেরুতে পেরুতে পেছন ফিরে দেখলাম পথের পাশে তুমি যেন এক স্থির ভাস্কর্য। তারপর একসময় দৃষ্টির আড়াল হলে। ঝাপসা হলো চোখ। কখন যেন আকাশের মেঘ আর মাটির কাশফুল মিলেমিশে এক হয়ে গেল। রেল স্টেশনে ঢোকার মুখে দমকা বাতাসের মতো এক দোকান থেকে ভেসে এল গানের এক ঝাপটা– 'বলেছিলে তুমি পাথরেও ফোটে ফুল'। সুরটা তীরের মতো বুকে এসে বিদ্ধ করল আমাকে। আর শুনতে পাই নি। শোনার ইচ্ছে থাকলেও সময় ছিল না। কারণ, তখন 'এঞ্জিনের ধস্‌ধস্‌, বাঁশির আওয়াজ' সব সুর ঢেকে দিচ্ছিল। হৃদয়ে তখন শুধুই রক্তক্ষরণ। গানের প্রথম কলি জানা হয় নি। মন খারাপ করা গান। তবে গানটা যে মান্না দে'র তা বোঝা গেছিল।

দাগ কেটে যাওয়া রেকর্ডের গানের মতো সারাক্ষণ বুকের ভেতর ঘুরেফিরে বাজছিল ওই একটিমাত্র কলি। আর হৃদয়জুড়ে ছড়াচ্ছিল বিষণ্ন এক অবসাদ। ঢাকায় ফিরে দোকানে দোকানে বহুদিন খুঁজেছি গানটা। প্রথম কলি জানা ছিল না বলে বেশ কয়েক মাস গানটার কোনো খোঁজ দিতে পারে নি কেউ। রাগ করে শেষের দিকে গাওয়া মান্না দে'র সব গানের ক্যাসেট কিনে ফেললাম 'গানের ডালি' থেকে। তারপর একটা একটা করে শুনতে লাগলাম রাতের পর রাত। পেয়ে গেলাম এক সময় আমার কাঙ্ক্ষিত গানের প্রথম কলি– 'মনে মনে যদি এত দূর, পায়ে পায়ে কেন কাছে আসা; সে অতীত তবে স্মৃতি হোক, শেষ হোক ভালোবাসা'। বৌদি, সে অতীত তবে স্মৃতিই হলো, ভালোবাসা শেষ হয় নি। তারপর আমার অপেক্ষা করে করে তুমি তিন বছর আলুই খাও নি। আমারও আর সময় হয় নি যাবার।

জানি, এ চিঠি আমার কোনোদিন পৌঁছবে না তোমার কাছে। তবু লিখছি, এই ভেবে যে আমার চিঠি পেতে তুমি পছন্দ করতে। পিওন হরিদাসকাকা তোমাকে যখন আমার চিঠিটা দিত, তোমার সে যে কী খুশি! হরিদাসকাকার কাছে শুনতাম সে কথা যখন তোমার বাড়ি বেড়াতে যেতাম। ছোটদা স্বল্প আয়ের মানুষ। বাড়ি বাড়ি ঘুরে শাড়ি লুঙ্গি গামছা বিক্রি করে বেড়াত ফেরি করে। সাইকেলের পেছনে সে সব গাট বেঁধে ঘুরে বেড়াত সাইকেলের পেছনে জীবন বেঁধে ঘুরে বেড়াত উঁচু-নিচু, আকা-বাঁকা মেঠোপথে গ্রামের পর গ্রাম। ছোট্ট একটা দোকান চালাতে তুমি সকালে বিকালে। মুদির দোকান। বিক্রি সামান্যই। সংসারের তেল-নুনের যোগানটা হতো। শাক-পাতা খেয়ে চলে যেত কোনোমতে। সংসারের শ্রী বাড়ত না। দাদার আয়ের টাকা দাদার পেছনেই যেত। পড়ালেখা তেমন করো নি। গরিব ঘরের মেয়ে। অভাবের সংসার। এ নিয়ে তোমার ভেতর একটা কুণ্ঠা কাজ করত সবসময়। আমি টের পেতাম। দারিদ্র্য ছিল, দীনতা ছিল না। টাকার অভাব ছিল, আন্তরিকতার অভাব ছিল না তোমার। তুমি যে মায়ের জাত।

মেজদা বড় চাকরি করত। জাহাজের চাকরি। ছ'মাস জাহাজে, ছ'মাস বাড়িতে। ফেরার সময় ক্যাটবেরি, লজেন্স। মেজবৌদি'র জন্য শালোয়ার, কামিজ, শাড়ি। সুগন্ধি পারফিউম, দামি কসমেটিক। মেজবৌদিও শিক্ষিত– বি.এ.। বাবা বড়লোক। সে গর্বে মাটিতে পা পড়ত না। তুমি থাকো চৌকিতে। ঘরে বিদ্যুৎ নেই। মেজবৌদির ঘরে সেগুনকাঠের খাট। বিজলি বাতি। ইলেক্ট্রিকের পাখা। মেজবৌদির পায়ে দামি জুতো, তোমার পা খালি। মেজবৌদির গায়ে বিলিতি ঘ্রাণ, তোমার গায়ে মাটির গন্ধ। জানো তো, মাটির গন্ধই আমার ভালো লাগত বেশি। তোমার বাড়িতে খুব ইচ্ছে হতো আমার বেড়াতে যেতে। আমার ইচ্ছে হতো তোমার ঘরে খেতে, তোমার ঘরে থাকতে। কিন্তু তার কোনো উপায় ছিল না। আমার কষ্ট হবে ভেবে মেজবৌদি তোমার ঘরে খেতেও দিত না, থাকতেও দিত না। তোমারও খুব ইচ্ছে হতো আমি তোমার ঘরে খাই, তোমার ঘরে থাকি। কিন্তু আমার কষ্ট হবে ভেবে তুমিও বলতে না খেতে বা থাকতে। কিংবা সাহসও পেতে না। মেজদি না

জানি কী বলে বা বকে বসেন। জানো তো, আমি সবই বুঝতাম। আমার জন্যে তোমাকে কোনো কথা শুনতে যেন না হয়, তাই মেজবৌদির কথামতোই আমি চলতাম।

মেজবৌদি কত কত পদ রান্না করত! বসে বসে একটার পর একটা তুলে দিত থালায়। খেতেই হবে সব। আমি কায়দা করে একটু একটু খেতাম। কম খেতাম। যাতে পেট খালি থাকে। ফাঁক পেলে তোমার ঘরে গিয়ে যাতে খেয়ে আসতে পারি। গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম– কী রান্না করেছেন বৌদি? তুমি বলতে– ঘেঁটকোলের ডগা বাটা, কুমড়ো শাখের তরকারি, খলসে মাছের ঝোল। তুমি কি আর এ সব খাবে ঠাকুরপো? মেজদির ওখানে তো তুমি ঘি-পটলভাজা, ডিম-ভুনা, রুই মাছের কালিয়া, মুরগির মাংস দিয়ে খেয়েছো? আমি বলতাম– ও সব আমার ভালো লাগে না। আপনি আমাকে এ সব দিয়েই খেতে দেন তো। তুমি ভয়ে ভয়ে খাবার দিতে। আমি তৃপ্তি সহকারে খেতাম। তুমি পলকহীন চেয়ে থাকতে আমার মুখের দিকে। আমার প্রত্যেক গ্রাসে যেন তোমার শান্তি। তোমার যে সে কী পরিতৃপ্তি! মনে আছে বৌদি, এক সকালে গরম ভাতের সাথে খেজুরগুঁড় দিয়েছিলে খেতে? আগে কখনও গুঁড় দিয়ে ভাত মাখিয়ে খাই নি আমি। আমি ইতস্তত করছিলাম দেখে তুমি বললে, খেতে ইচ্ছে না হলে থাক ঠাকুরপো, খেও না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ভাত মাখিয়ে খেলাম। এত মধুর লেগেছিল যে, এরপর আমি মাঝেমাঝেই খেজুরগুঁড় দিয়ে ভাত মাখিয়ে খেতে চাইতাম। একদিন হলো কী, চাল ধোয়ার সময় টিউবওয়েলে বালি উঠেছিল। সব ভাত বালি কিচকিচ করছিল। একটু খেজুরেগুঁড় দিয়ে ভাত মাখিয়ে নিলাম। ব্যস, আর বালি টের পাওয়া গেল না। তোমার যে সে কী হাসি!

পাশেই ছিল তোমার বাবার বাড়ি। তিন/চার মিনিটের হাঁটাপথ। তোমার বোন অমিতা তখন কলেজে। ফার্স্ট ইয়ার। সবে শাড়ি ধরেছে। দেখতে খুব সুশ্রী নয়। গায়ের রঙ চাপা। কিন্তু মুখে কী এক অদ্ভুত বুদ্ধিদীপ্ততা ছিল। ঘঁষা পাথরেওতো ঔজ্জ্বল্য ফোটে? বাবা-মা না থাকায় দু'হাতে সব সামলাতে হতো তাকেই। অনেক পরিশ্রমের মধ্যেও তার মুখে নির্মল হাসি ছিল। আমি বিমোহিত হতাম। সংসারে অভাব ছিল যথেষ্ট। ভাই বি.এ. পাস। বেকার। রাজ্য সরকারের লটারির টিকিট বিক্রি করে যে দু'পয়সা পেত, তাতে সংসার ঠিকমতো চলত না। অমিতা বিকেলে বিকেলে তাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিচু ক্লাসের দু'একটা ছেলেমেয়েকে পড়াত। বোতনদার কপালে পাত্রী জুটল না বেকার বলে। অমিতার বিয়েও তাই থেমে থাকল। বোতনদার মাথায় একসময় গণ্ডগোল দেখা দিল হতাশায়। এ নিয়ে তোমার সে যে কী মানসিক কষ্ট! দুশ্চিন্তা তোমার সবসময়ের সঙ্গী ছিল। দুপুর গড়িয়ে রোদ যখন হেলে পড়ত, ছায়ার নিরালায় বসে কাঁথা বুনতে বুনতে এসব প্রায়ই আমাকে বলতে। আমি তোমার দীর্ঘশ্বাস টের পেতাম। তোমার কষ্টটা আমাকে জড়িয়ে থাকত। তোমার গায়ে কেমন একটা আটপৌরে গন্ধ ছিল। মাটির গন্ধ। মা মা গন্ধ। মায়ের কথা মনে পড়ত। মা না থাকার কষ্ট ভুলে যেতাম। তুমি ছিলে আমার বৌদি, বন্ধু, মা।

সারাদিন পথে পথে ঘুরে শাড়ি-লুঙ্গি-গামছা বিক্রি করে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দু'টো খেয়ে ছোটদা বেরিয়ে পড়তেন রেলপাড়, গাঁজার আড্ডায়। রাতে ফিরে এসে তোমাকে গালিগালাজ, মারধোর। এসব ছিল নিত্যদিনের বিষয়। তুমি সব সইতে মুখ বুঁজে। হাসিমুখে সকালে আবার ভাত রান্না করে দিতে। কলমিশাকের ঘণ্ট, লালশাক ভাজি, চালতার টক। খেয়েদেয়ে ক্রিংক্রিং বেল বাজিয়ে ছোটদার বেরিয়ে পড়া আবার। সন্ধ্যায় ফিরে এসে আবার রেলপাড়। গাঁজার আড্ডা থেকে একদিন ফিরলেন না দাদা। আর ফেরেন নি। ফিরেছে তার নিথর দেহ। মুখে রক্তবমির দাগ। তুমি রঙিন শাড়ি ছেড়ে সাদা থান পরলে। অবশ্য তোমার শাড়ি রঙিন ছিল না কোনোকালে। দামি শাড়ি তো পরতে পেতে না। তাছাড়া সহজেই ময়লা হয়ে যেত। পরিষ্কার করার মতো সোডাও যোগাতে পারতে না। তাই লাল না সবুজ, শাড়ির রঙ বোঝা যেত না। দাদা ছিল শাড়ির ফেরিওয়ালা। অথচ তোমার পরনে ছিল না দামি শাড়ি। শত দুঃখের ভেতর আর এক দুঃখের যোগ। তুমি বিধ্বস্ত হয়ে গেলে। মাতাল স্বামী মারধোর করলেও তার অস্তিত্ব ছিল সংসারে। সলতে পোড়ালেও আগুন আলো তো দেয়। এবার তুমি নিঃসঙ্গ হলে। ভাঙা বাসন-কোসনের মতো দুঃখ-কষ্ট যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকল

তোমার চারপাশে। তোমার জন্যে এতটুকু শান্তি জমা ছিল না সংসারে। সব ময়লার যেমন ভাগাড়ে স্থান হয়, সব কষ্টেরও যেন তেমনি তোমাতেই স্থান। তোমার কষ্ট যেন ধুতুরার বিষ।

আচ্ছা বৌদি, তোমার কি মনে মনে একটু ইচ্ছে ছিল যে তোমার বোনটাকে আমি বিয়ে করি? ওর সাথে আমার ভাব হোক? ভালোবাসা হোক? একটু হলেও জীবনে অন্তত স্বস্তি পাও তুমি? নির্ভরতা পাও? আমার অবশ্য তেমন ভাবনা ছিল না। তবে তখন তরুণ বয়স। সদ্য গোঁফ উঠেছে। জল যেমন ঢালুর দিকে ধায়, নারীর প্রতিও তেমনি আগ্রহ জন্মাতে শুরু করে তরুণদের। একটু ভালোলাগাতো থাকতেই পারে রক্তে। সেটা নিছকই মিষ্টি আবেগ। তাতে আর দোষ কী এমন? তুমি মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যেতে ওবাড়িতে। গিয়ে বলতে– 'অমিতা দ্যাখ, কাকে নিয়ে এসেছি? চা করে দে। একটু গল্প-টল্প কর?' আমার কান গরম হয়ে উঠত লজ্জায়। রক্ত জমে যেত মুখে। অমিতা ছুটে পালাত। বাঁকা চোখে তাকাত। ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি। সম্পর্কটা এমনই ছিল। এই মেঘ, এই রোদ। সে সব আজ স্মৃতি। শুকনো বোঁটার কুঁড়ির মতো ঝরে গেল ফুল। ফুটল না।

সে বার দুর্গা পূজায় তোমাদের ওখানে ছিলাম। ষষ্ঠীর দিনে নতুন একটা শার্ট কিনে এনে দিয়েছিলে বাজার থেকে। আমাকে না জানিয়েই। পুজো দেখতে বেরুবার মুখে দিলে। লাল রঙের ছাপার শার্ট। আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। পুজোর ক'দিন ওই একই শার্ট পরেছিলাম। অষ্টমীর দিন তুমি, আমি, অমিতা– আরও অনেকে মিলে আমরা পুজো দেখতে বেরিয়েছিলাম। পায়ে হেঁটে হেঁটে কাছাকাছি যতগুলো মণ্ডপ ছিল সবগুলো দেখেছিলাম। মিষ্টিপান খেয়েছিলাম সবাই। ভিড়ের মধ্যে কখন যেন অমিতা আমার হাত ধরেছিল। ইচ্ছে করে, নাকি ভিড়ের ভয়ে– তা বুঝি নি। আমি কেঁপে উঠেছিলাম। হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। গতি শ্লথ। কেমন একটা অনুভূতি– বলে বুঝানো যাবে না। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। মুচকি হাসছিল অমিতা। লজ্জা পেয়ে ছেড়ে দিল হাত। ইচ্ছে থাকলেও আর ধরতে পারি নি হাতটা। সংকোচে। এ যেন জলের গেলাশ পড়ে যাওয়া তৃষ্ণার্তের ঠোঁটের কাছ থেকে। হঠাৎ। তুমি কি দেখে ফেলেছিলে? না হলে তুমিও হাসছিলে কেন দুষ্টু হাসি? ওই স্পর্শের সুখটুকু আমার হৃদয়ের সঞ্চয় হয়ে থাকল। আমার কোনো দোষ ছিল কিনা জানি না, তবে অমিতার দিকে তাকাতে লজ্জা করছিল।

বিজয়া দশমী। বিসর্জনের রাত। সব বিসর্জনের রাতই কষ্টের হয়। বুকের মধ্যে কেমন যেন লাগে। কেমন যেন সুঁচফোঁটা এক কষ্ট। আবার এও সত্য– চিরকালই ওই রাত জ্যোৎস্নায় ভরে থাকে। সেদিনও তেমনি চালগুঁড়ি আলোর জোয়ার। ফোটা শিউলির বুকে চাঁদের কিরণ। উঠোনে বাঁশঝাড়ের ছায়া। দুলছিল। ছায়ার কোনো রঙ থাকে কিনা জানি না। আমার মনে হচ্ছিল, সেদিনের ছায়াটা সবুজ ছিল। তার ফাঁকে চাঁদ। বিজয়ার চাঁদ। কোথাও থেকে ভেসে এসছিল ছাতিমফুলের ঘ্রাণ। তার সাথে মিশেছিল দূর থেকে ভেসে আসা ঢাকের বাদ্য। বেহাগী সানাই। মোহনীয় রাত। স্মৃতি তখন স্পর্শের সুখে বিভোর। একটা ছায়া এসে কাছে দাঁড়াল। অমিতা। আমি চমকে উঠলাম। অমিতা আমার পা ছুঁলো। প্রণাম করল। বিজয়ার প্রণাম। তুমি কি দেখেছিলে আমাদের সেই নীরব নির্জন আত্মনিবেদন? পরদিন চলে এসেছিলাম বাংলাদেশে। ভুলে সেই শার্টটা ফেলে এসেছিলাম। তোমার যে সে কী মন খারাপ! চিঠিতে লিখেছিলে সে কথা। আমারও কষ্ট হয়েছিল খুব শার্টটা ফেলে আসায়। আর ফেলে এসেছিলাম অমিতাকে। সাথে নিয়ে এসেছিলাম স্মৃতি। কিছু হিরণ্ময় মুহূর্ত। আমি যখন রিক্সায় আসি তখন অমিতা কাছে ছিল না। তবে আমি তাকে দেখেছি। দূর থেকে, গাছপালার আড়াল থেকে সে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল আমার চলে আসা। কী এক আকুতি দেখেছি সে চোখে। কিছু কথা ছিল হয়তবা কিংবা ছিল না। নিরর্থক তাকানো। অহেতুক চেয়ে থাকা। তারপর ঝাপসা চোখে অমিতা দূরের জলরঙে আঁকা ছবি। সে চলে আসাই যে আমার শেষ আসা হবে, তা কে জানতো? অমিতা এখন কোথায় আছে, কেমন আছে– জানি না। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে যে হৃদয়ের সীমানা নির্ধারিত? জানার উপায় কী?

তার পরের বার পুজোয় তোমার বাড়ি আসার কথা ছিল। পিরোজপুরে। তোমার বাবার বাড়ি। দেশভাগের সময় এ দেশ ছেড়েছিলেন তারা। সাতচল্লিশে। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু আর পুকুরভরা মাছ ছিল। সে সব ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। নিঃস্ব হয়ে। ভিখিরির বেশে। দেশভাগ মানুষের হৃদয়টাকেও বিভক্ত করে দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি সমাজ, সংসার, সংস্কৃতিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছিল। তখন তোমার জন্ম হয় নি। তোমার জন্ম ওদেশে। তোমার খুব ইচ্ছে ছিল বাংলাদেশটা দেখার। এ দেশের মানুষ এত ভালো, এত ভালো এদের ব্যবহার, আতিথিয়েতা– এ সব শুনে শুনে তোমার খুব দেখতে ইচ্ছে জাগত বাংলাদেশ। না এসে ভালোই করেছ। তোমার চোখে সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা সোনার বাংলাই থেকে গেল। রুক্ষ মরু আর দেখতে হলো না। দেখতে হলো না বোমায় পোড়া ছিন্ন-ভিন্ন দেহ, গলাকাটা লাশ, বস্তাবন্দি শিশুর কোমল ছোট্ট নিথর শরীর। তুমি যে বাংলাদেশের কথা শুনেছ সে দেশে নদী ছিল। ছিল বনভূমি। নেই। এখন সে মানুষও নেই। পদ্মা-মেঘনায় ইলিশ পাওয়া যেত প্রচুর। রুপোলি ইলিশ। এক বাড়ির ইলিশ ভাঁজার গন্ধ পাওয়া যেত আরেক বাড়ির উঠোনে। এখন মাছই নেই। এখন এলে তুমি নদীই পাবে না কোথাও। আর তো ইলিশ। শীতলক্ষ্যা, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরীতে এখন নর্দমার প্রবাহ। বাতাসে দুর্গন্ধ। না এসে ভালোই করেছ বৌদি।

তুমি এলে না পরের বার। পরের পুজোয়। জানি না কেন আস নি। কোনো বারই না। কোনো পুজোতেই না। কোনোদিনই এলে না। নাড়ীর টান নদীর স্রোতের মতো পরাস্ত হলো। কিন্তু কোনো পুজোই আর সম্পূর্ণ হয় না আমার। তুমি ছাড়া সব পুজোই যেন অসম্পূর্ণ আমার। পুজো এলেই ভাবি তোমার আসার কথা ছিল। কথা ছিল এক সাথে পুজো দেখার। আসা হয় নি। হবেও না আর কোনোদিন। শুধু রয়ে যাবে স্মৃতি। দুঃসহ স্মৃতি। আর পুজো এলেই সে বেশি করে প্রকট হবে। আমাকে স্বস্তি দেবে না। অমিতা, তুমি, সেই লাল জামা, সেই চাঁদের আলোমাখা রাত– আর ফিরে পাব না। কখনওই না।

অনেক কষ্ট সইতে হয়েছে তোমাকে সারা জীবন। কারো কারো কপালটাই থাকে এ রকম। সুখ সয় না। তোমার দাদা, বোতনদা বেকারত্বের জ্বালা সইতে না পেরে গলায় ফাঁস দিল। আত্মহত্যা করল। অমিতা আরও একা হয়ে গেল। লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল। এ দেশের মেয়েদের একা থাকাটা যে কত কষ্টের, তা তোমার চেয়ে আর কে ই-বা ভালো জানবে। সেধেকেটে অবশেষে তোমার কাছে নিয়ে এলে। কিন্তু বিয়েটা দিতে পারলে না। লেখাপড়া কম জানা অসুন্দর মেয়েকে কে বিয়ে করবে? আশ্রয় তাই তোমার কাছে। কষ্টকর প্রতিটা দিন শুধু পার করে দেয়া। সময় প্রতিদিন তার ভয়াল বিষদাঁত বসিয়ে যায় তোমার বুকে। তুমি বিষে বিষে জর্জরিত হও। কবে কখন যেন আস্তে আস্তে ঢলে পড়লে মাটিতে, নিজেও জান না। তোমার মুখে তবু নির্মল হাসি। এত হাসি কোথায় লুকোনো ছিল? কী করে পারতে তুমি প্রদীপের মতো জ্বলে জ্বলে আলো ছড়াতে?

গ্রামের বাড়িতে কয়েকদিন কাটিয়ে এলাম কিছুদিন আগে। গ্রামগুলোও যেন কেমন হতচ্ছাড়া হয়ে গেছে। আগের মতো সেই আটপৌরে ভাব নেই। এখন বোতাম টিপলেই আলো। জোনাকিরাও তাই বিদায় নিয়েছে। আর পাকা সড়ক ধ্বংস করেছে নিসর্গ আর নৈঃশব্দ। মানুষ এখন অনেক বেশি যান্ত্রিক। তোমার এক আত্মীয়ের সাথে দেখা। তার সাথে আলাপ হতেই তোমার কথা জিজ্ঞেস করলাম। তার মুখেই শুনলাম খবরটা। মাথায় বাজ পড়লেও এত আঘাত পেতাম না। আমি যেন দ্বিতীয়বার মাতৃহারা হলাম। নিজেকে অপরাধী মনে হলো। বহুদিন কোনো খোঁজ নেই নি তোমার। কোনো চিঠি লিখি নি তোমাকে। অথচ একটা চিঠি পাওয়ার জন্যে তোমার সে যে কী হা-পিত্যেস। দেখা হলেই পিওন হরিদাসকাকাকে জিজ্ঞেস করতে, আমার কোনো চিঠি আছে কিনা। কেউ বলে না দিলেও আমি জানি বিষয়টা। বুঝতে পারি। আর বলব না– 'ভালো থেকো'। এখন তুমি সব কিছুর ঊর্ধ্বে। সমস্ত চাওয়া-পাওয়া-কষ্ট-যন্ত্রণার অতীত।

বৌদি, আজ তোমাকে শেষ বারের মতো একবার 'মা' বলে ডাকি? খুব ইচ্ছে হচ্ছে। কেউ জানবে না। তুমিও না। তুমি তো আমার মায়েরই মতো। তোমাকে লেখা এ আমার শেষ চিঠি। জানি আমি, এ চিঠি কখনও কোনোদিন পৌঁছবে না তোমার কাছে। এ চিঠি তবু আমি পাঠিয়ে দেব তোমার ঠিকানায়। হরিদাসকাকা বেঁচে থাকলে এ চিঠি পাবেন ঠিকই। প্রণাম।

ইতি–

তোমার আদরের মিঠুন।

দড়ির প্রান্তে জ্বলে আগুন

দড়িটা জ্বলছে। কতদিন যাবৎ যে তা কেউ জানে না। মনে নেই কারো। ছিদামেরও না। পনের/ষোল বছর তো হবেই। ছোটবেলায় এ দোকানে যারা দড়ির প্রান্তে আগুন জ্বলতে দেখেছিল তারা এখন অনেক বড়। আগে হাফ-প্যান্ট পরতো। এখন লুঙ্গি। তারা বড় হয়েছে। বিয়ে করেছে। তাদের সন্তান হয়েছে। তাদের বাচ্চারা এখন তাদের ছেলেবেলার সমান হয়ে গেছে। যে সব মেয়েরা বাচ্চা ছিল তারা এখন প্রাপ্ত-বয়স্ক নারী। আগে ফ্রক পরতো। এখন ছায়া-ব্লাউজ-শাড়ি। তাদের বাচ্চারা এখন তাদের ছোটবেলার সমান হয়ে গেছে। কেউ কখনও দড়ির আগুন নিভতে দেখে নি। ঝড় বাদল বৃষ্টি– দড়ির প্রান্তে আগুন। সযত্নে দোকানি জিইয়ে রেখেছে তার দড়ির আগুন। রাতে ঘুমুতে গেলেও, কোথাও বেড়াতে গেলেও, অসুখ-বিসুখ করলেও আগুন নিভতে দেয়া যাবে না। নিভতে দেয় নি। নিজে না পারলে অন্যকে নিয়োজিত রেখেছে তদারকিতে। দড়ি শেষ হয়ে যাবার আগেই আর একটা দড়ি জুড়ে দেয় দড়ির লেজে। অনন্ত আগুন তাই জ্বলতেই থাকে। এ আগুনে শিখা নেই কোনো। শুধু আগুন। গনগন করে জ্বলতে থাকে। দড়িটা পুড়ে পুড়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে আগুনটাকে বাঁচিয়ে রাখে। নাকি ছিদামকে?

ছিদাম পান-বিড়ির দোকানদার। মনোহারি মালও আছে। চাল ডাল তেল নুন চিড়া মুড়ি হলুদ মরিচ বিস্কুট সবই আছে। তবে পান-বিড়িটা সবসময় চলে। বিড়ি খায় না এমন মানুষ কমই আছে গ্রামে। ছেলে-বুড়া সব। বুড়ো বুড়ো মহিলারাও বিড়ি খায় আর খুকখুক করে কাশে। বউ-ঝিরাও খায় মাঝেমধ্যে লুকিয়েঝুকিয়ে। সারাক্ষণ লোকে মুখে আগুন দিয়েই চলেছে। পান খেলে যেমন চুন ফ্রি, বিড়ি-সিগারেট খেলেও তেমনি আগুন ফ্রি। ম্যাচের খরচ পোষাণো কঠিন। তাই প্রথম জীবনে, দোকান শুরুর সময় দড়ির প্রচলনটা শুরু করেছিল বুদ্ধি করে। যার যত আগুন লাগে, সে দেবে। যত আগুন লাগুক, নিয়ে নেও এখান থেকে। এ আগুন ফুরায় না কখনও। অফুরন্ত আগুন। মজার বিষয় হচ্ছে আগুন থেকে আগুন নিলেও আগুন কমে না একটুও। পৃথিবীর অভ্যন্ড়রের আগুন নিভে যাবে, এ আগুন নিভবে না কখনও। ছিদামও যেন দড়ির প্রান্তে জ্বলা আগুনের মতো নিয়ত জ্বলছে। মনের গভীরে পুষে রেখেছে এক অনিঃশেষ গুপ্ত আগুন। কাউকে জানানো যাবে না এ আগুন-রহস্য।

প্রথম যৌবনে দোকানটা যখন শুরু করে ত্রিশ-বত্রিশ বছরের টগবগে যুবক তখন ছিদাম। সবে বিয়ে করেছে। যদিও তার অমত ছিল। বাবা-মা'র পছন্দে বিয়ে। খুব সুন্দরী না হলেও শেফালি বেশ বুদ্ধিমতী। তাই মানিয়ে নেয়া। দোকান থেকে ভালোই আয় তার। সারাক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্য দড়ির ব্যবস্থা। তারই কিছুদিনের মধ্যে ঘটল ঘটনাটা। ঠিক ঘটনা নয়, স্বপ্ন। একটা স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন নাকি দুঃস্বপ্ন? ভয়ঙ্কর। কাউকে বলে নি। বলা যাবে না। সেই থেকে স্বপ্নটা তাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে খাচ্ছে। কুঁড়িয়ে কুঁড়িয়ে খাচ্ছে। মনে এক অজানা আতঙ্ক ঘাপটি মেরে রয় সবসময় কালকেউটের মতো। ছিদাম স্বপ্ন দেখে এক রাতে। কালো এক আলখেল্লা পরা দরবেশ তার সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে– দড়িতে আগুন দিলি? সাপের লেজে আগুন? খবরদার, এ আগুন যেন কোনোদিন না নেভে। দড়ির এ আগুন যেদিন নিভে যাবে, সেদিন তোরও মুত্যু হবে। আর এ কথা কাউকে কখনও বলিস না। বললে তোর ভয়ঙ্কর অমঙ্গল হবে। সর্বনাশ হবে। সাবধান! এ বলে দরবেশ অন্তর্ধান হলেন। হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে ছিদাম বেঁচে থাকে। বুকে যেন বাঁধা রয়েছে ভয়ঙ্কর এক মাইন। এক প্রান্তে জ্বলন্ত আগুন। অন্য প্রান্তে মাইন। আগুনের প্রান্ত মাইনের স্পর্শে এলেই বিস্ফোরণ। কী এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা সযত্নে লালন করছে ছিদাম কতটা বছর তা একমাত্র সে-ই জানে। দড়িটা যেন মৃত্যুহীন অগ্নিমুখো সাপ ছোবলে ছোবলে দংশন করে সারাক্ষণ।

খগেনের ছেলে কেষ্টা খেয়াল করেছে বিষয়টা। দুষ্টুমি করে আগুনটা নেভানোর ফন্দিও করেছিল কয়েকবার। সাহসে কুলোয় নি। একদিন জিজ্ঞেস করে বসে–

– ও কাগা, হপ্তা খানেক দেহি গাদাল গ্যালো, যা কাইচান, গরের থোনইতো বাইরয় নাই কেউ, তেমু তোমার দড়ি জ্বালাইয়া রাখছো ক্যান?

– ও তুই বুজবি না। পেত্যেক কামের এ্যাট্টা কারণ থাহে।

– তা কী কারণ, কবাতো?

– তোর হেয়া দিয়া কী কাম? পোলাপানের হগলতা জানতে অয় না।

এরপর আর কথা চলে না। সে পোলাপান মানুষ– এ কথায় সে বেশ রুষ্ট হলো। তার ধারণা, তার বিয়া করার বয়স হয়ে গ্যাছে। বিয়ে করলে তারও পোলাপান অইতো। তারে পোলাপান বলাডা ঠিক না। কথাটায় সে মাইন্ড করেছে। কেষ্টা তাই কুমড়োপটাস। চুপ। কিন্তু চুপ হলেও বুকের ধুক্‌পুকানি কমে নি কেষ্টার। মনের ভেতর খচ্‌খচানি। কুর্‌কুর্‌ করে এক অজানা ঘুণপোকা। দড়ির প্রান্ড়ে জ্বলা আগুনের দিকে ঠিকই চেয়ে থাকে। খেয়াল রাখে। ভাবে। মনে মনে কারণ খোঁজে। আর এর-ওর কাছে বিষয়টা আলোচনা করে। এক কান দু'কান পাঁচ কান হয়ে কথাটা বিশ কান হয়ে যায়। বাতাসে চাউর হয়ে যায়। বিষয়টা এখন ওপেন সিক্রেট। সবার মনেই দড়ির প্রান্তে জ্বলা আগুন নিয়ে প্রশ্ন। কেউ কেউ এসে এক মনে তাকিয়ে থাকে দড়িটার দিকে। নিস্পলক। যেন আজব কোনো জিনিস দেখছে। অথচ এই দড়িটাই দেখছে বহু বছর যাবৎ। মনে কোনো সন্দেহ জাগে নি। প্রশ্ন জাগে নি। দড়িটা একটা দড়িমাত্রই ছিল। কিন্তু আজ যেন দড়িটা শুধু একটা দড়ি নয়, অন্য কিছু। গোপন কিছু। তাৎপর্যপূর্ণ কিছু। গূঢ় কিছু।

কথাটা তার বউ শেফালির কানেও যায়। গ্রামের মানুষ তিলকে তাল বানায়। এক কান দু'কান পাঁচ কান হয়ে মূষিক পাহাড় হয়ে যায়। রাজার ছোট রানি ঝাঁকে ঝাঁকে কাক প্রসব করে। কথাটা এই– ছিদামের বউ শেফালির সাথে তার বিয়ে হওয়ার আগে পাশের বাড়ির ফুলমালার সাথে তার ইয়ে হয়েছিল। এ বিয়েতে তার মত ছিল না। জোর করে তাকে শেফালির সাথে বিয়ে দেয়া হয়। এ যন্ত্রণা তাকে দগ্ধ করতে থাকে। আত্মদংশনস্বরূপ তারই প্রতীকী প্রজ্বলন এ আগুন। সারাজীবন সে এই দড়ির মতো জ্বলতে থাকবে। আর ফুলমালা আগুনের মালা হয়ে সারাজীবন তার গলায় জ্বলতে থাকবে। তাকে দগ্ধ করতে থাকবে। শেফালির গায়েও সে উত্তাপ লাগল। এবারে সে ফ্ল্যাশব্যাক করে ঘটনার সত্যতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে লাগল। বিয়ের পর থেকেই শেফালি খেয়াল করেছে ফুলমালা মাঝেমাঝেই এ বাড়িতে আসে। মুচ্‌কি হেসে ছিদামের সাথে কথা কয়। কখনও কখনও গায়েও ঢলে পড়ে। ফুলমালার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেও যখনই সে বাবার বাড়ি এসেছে, ছিদামের সাথে দেখা করতে এসেছে। এখন পড়ন্ত বয়স। তবু দু'জনের দেখা হলে কথা মোটে আর ফুরোয় না। এতদিন অবশ্য বিষয়টাকে শেফালি খারাপ মনে করে নি। আমল দেয় নি। মনে কিছু করেও নি। কিন্তু দড়ির প্রান্তে জ্বলা আগুনের আঁচ তার গায়ে লাগতেই সেও তেঁতে উঠল। এবারে দুয়ে দুয়ে চার মিলাতে শুরু করল। শুরু হলো গাত্রদাহ। বুড়ো বয়সে শুরু হলো গৃহদাহ।

শেফালি ছিদামের দোকানে খুব একটা যায় না, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া। একেবারে রান্নার মুখে হঠাৎ যদি তেল-নুনের টান পড়ে, তখনই কেবল সে দোকানে যায়। দড়ির প্রান্তে জ্বলা আগুনটা সে দেখেছে বহুবার। কিন্তু তা তার মনে কোনো প্রভাব ফেলে নি। এবং তার কোনো প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হয় নি। সব পান-বিড়ির দোকানেই তা থাকে। এ আর এমন কী? সম্প্রতি কথাটা শোনার পর একদিন সে দোকানে গেল তদন্ত করতে। কথটা সত্য। দোকানের কোণায় ঝুলন্ত একটা পেঁচানো দড়ির কুণ্ডলি। তার যে প্রান্ত ঝুলছে, সে প্রান্ত জ্বলছে। দেখল। সব পান-বিড়ির দোকানে জ্বলন্ত দড়ি থাকে, কিন্তু তা নিভিয়ে ফেলা হয়। সময় হলে আবার জ্বালায়। কিন্তু ছিদাম কখনও নিভায় না। দোকান বন্ধ হবার পর রাতেও না। রাবণের চিতার মতো জ্বলে। এটাই সন্দেহের। কিন্তু ছিদামকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। এখন প্রশ্ন করার সময় নয়। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় যখন যাবে, তখন কুরুক্ষেত্রের সময়।

আজকের খাওয়াটা বিশেষ সুখকর হয় নি ছিদামের। কোনোটায় লবণ বেশি, কোনোটায় ঝাল। শেফালিও যেন কেমন রোবটের মতো খাবার পরিবেশন করে যাচ্ছে। কথা নেই, বার্তা নেই, যেন বিয়ে করা নতুন বউ। আবার ঠিক তাও নয়। বিষয়টা চোখে পড়েছে ছিদামের। ঝড়ের পূর্বাভাস। কিন্তু টু শব্দও করে নি ছিদাম। রান্নায় মন ছিল না শেফালির। আজ কেমন যেন আনমনা ছিল। এতকালের বিশ্বাস সস্তা চিনেমাটির প্লেটের মতো টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল। ঘুমুনোর আগে ছিলিম খাওয়া অভ্যেস ছিদামের, যদিও পান-বিড়ির দোকানদার সে। পডড়পডড় করে কয়েকটা টান দিল হুঁকোয়। তাও বিস্বাদ। ছিলিম রেখে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। একটু পরেই শেফালির মঞ্চে প্রবেশ শিখণ্ডীরপ্রায়। এসেই পিদিম নিভিয়ে দিল। ধৃতরাষ্ট্রের চোখের মতোই অন্ধকার নেমে এল। এবার কুরুক্ষেত্রের রণ। অন্ধকার কুরুকক্ষে কী হলো তা আর জানা যায় নি। তবে সকাল থেকেই আকাশে মেঘ। জমকালো মেঘ।

দিন যায়। ঘন হয়ে ওঠে মেঘ। থমথমে আকাশ। অবশেষে বাদলা। বউয়ের প্রশ্নের উত্তর অজানাই থেকে যায়। এ উত্তর যে দেয়া সম্ভব নয়। আগুন নিভলে ছিদামের মৃত্যু। আর এ স্বপ্নের কথা বললে পরিণতি ভয়াবহ। একেই বলে শাঁখের করাত। ছিদাম যতই চুপ থাকে, শেফালি ততই দড়ির মতো জ্বলে। একে রামে রক্ষা নেই তায় আবার সুগ্রীব দোসর। বাদলার সাথে যোগ হলো বাতাস। ঝড়ো হাওয়া। এ সময়ে বাপেরবাড়ি এল ফুলমালা। শেফালির গায়ের জ্বালা। কাহাতক সহ্য করা যায়। বাণপ্রস্থের আগেই শেফালির বনবাস। একদিন ঘর ছেড়ে পা বাড়াল বাপেরবাড়ি। ছিদাম সহজ-সরল মানুষ। জটিল অঙ্ক তার মাথায় খেলে না। সাত-পাঁচ ভেবেও কোনো কূল পেল না। এ নদী কূলবিহীন। বউকে ফিরিয়ে আনতে কিষ্কিন্ধায় গমন। এক সন্ধ্যায় শ্বশুরবাড়ি এসে হাজির বলরাম। বউয়ের শর্ত– দড়ির প্রান্তে জ্বলা আগুনের রহস্য না বললে প্রত্যাবর্তন নয় গৃহে। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। বললে পরিণতি ভয়াবহ। না বললে গৃহদাহ। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। তীরে এসে তরী বুঝি যায় ডুবে। কী আর করা? রাজি। বাড়ি ফিরে বলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বউকে রাজি করানো।

দড়ির প্রান্তে জ্বলা আগুনের রহস্য বলতেই হবে। না বললে সঙ্কট। বললে পরিণতি ভয়ঙ্কর। আর আগুন নিভিয়ে দিলে মৃত্যু অনিবার্য। এই ত্রিকোণ দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত ছিদাম। কোনটি শ্রেয় এর ভিতর? বেছে নিতে হবে। ভয়ঙ্কর পরিণতিটা কী, তা জানার উপায় নেই। ওরকম বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই বরং ঢের ভালো মনে হলো ছিদামের কাছে। 'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান' কথাটা সে জানে। কীর্তন গানে শুনেছে। মৃত্যুই বেছে নিল ছিদাম। ছিদাম সকলকে ডাকল এক সন্ধ্যায়। কেষ্টাকে বলল প্রান্তে আগুনজ্বলা কুণ্ডলায়িত বিষধর সাপের মতো দড়িটা আনতে। গ্রামের অনেকেই উপস্থিত এ রহস্যের সাক্ষী হতে। ফুলমালাও। তাকে দেখে শেফালির গায়ের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে উঠল। ছিদামের ভাব কেমন শান্ত সমাহিত। কোনো ভাবাবেগ নেই তার। যেন কোনো যন্ত্রণা ছোঁয় না তাকে। মনে হয় শ্মশানযাত্রায় প্রস্তুত। একটু পরেই তার ভবলীলা সাঙ্গ।

কোনো দরবেশের ভঙ্গিতে কেষ্টাকে ইশারায় কাছে ডাকল। এক বালতি জল আনতে বলল। জল এল। এরপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল– 'দড়ির মাথায় জ্বলা ওই আগুনটা আমার জীবন। জীবন আমাকে বিদায় জানাবে। কেষ্টা, আমি হাতে তুড়ি দিলে তুই দড়ির আগুনটা জলে ডুবায়ে দিস'। ফুলমালা কী বুঝল কে জানে, ডুকরে কেঁদে উঠল। মড়াকান্না। তা দেখে শেফালির অঙ্গে বিদ্যুতের মতো বিষজ্বালা খেলে গেল। বউয়ের চেয়ে সতিনের শোক বেশি। কেষ্টা নিজেকে মনে মনে বীর ভাবছে। সবাই তার দিকে তাকিয়ে– কখন সে দড়ির মাথাটা জলে ডুবিয়ে দেবে, তখন কিছু একটা ঘটবে। কী ঘটবে, তা জানে না। রহস্যের সমাধান হবে। রুদ্ধশ্বাসে সে ছিদামের তর্জনীর দিকে তাকিয়ে। ছিদাম চোখ বুঁজে ইষ্টনাম জপে। তারপর চোখ খুলে তুড়ি দেয়ার জন্যে হাত তোলে উর্ধ্বপানে। আকাশে। ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো আসামির সামনে জল্লাদ যেমন ইশারার অপেক্ষায় চেয়ে থাকে ম্যাজিস্ট্রেটের তর্জনীর দিকে, কেষ্টাও তেমনি তাকিয়ে। সময় আসন্ন। এখনই তুড়ি বাজবে। আর এমন সময় ঘটল কাণ্ডটা।

দর্পণ

ভাঙা এক টুকরা আয়না। ত্রিভুজ আকৃতির। আধা ইঞ্চি বাই দেড় ইঞ্চি বলা যায় না, কারণ আয়নাটার এক দিক কোণাকৃতির। ত্রিশ ডিগ্রির মতো। সুচালো। অন্য পাশ আধা ইঞ্চি চওড়া। আর ত্রিশ ডিগ্রি কোণ থেকে চওড়া পাশ পর্যন্ত দেড় ইঞ্চি লম্বা। তাই সাইজ বা আয়তন ঠিক মতো বলা গেল না। তবে আকৃতিখানা বলা গেল। তার পেছনের দিকে পারদের খয়েরি পারা ঘঁষা লেগে মাঝে মাঝে চটে গেছে। একে আয়না না বলে কাচের টুকরাই বলা উচিত। কিন্তু কাচের টুকরা না বলে তাকে 'আয়না'ই বলতে হবে, কারণ ওতে মুখ দেখার বিষয়টি জড়িত। ওইটুকু আয়নায় আসলে একসাথে পুরো মুখমণ্ডল দেখা যায় না। তা সম্ভবও নয়। একটা চোখও পুরোপুরি দেখা যায় না। বেশ মনোসংযোগ করে তবেই চোখের কোনো একটা অংশ কিংবা নাকের কোনো অংশ বা কোনো একটা ব্রণ দেখতে পাওয়া যায়। নাক-চোখ-মুখের এই টুকরো-টাকরা ছবি ঠিকঠাক মতো মনের মধ্যে জোড়াতালি দিয়ে তবে নিজের চেহারাটা আন্দাজ করে নেয়া যায়। অন্ধের হস্তী-দর্শনের মতো এই আর কী?

প্রকাশ্য দিবালোকে, শরতের দুপুরবেলা, বাইরের আকাশে যখন ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর– সেই সময় 'জাতির মননের প্রতীক' বাংলা একাডেমির দক্ষিণ পাশে মানে (সমাজতন্ত্রের ভাষায়) ডান পাশে, পুষ্টিভবনের পুবপাশে, তিন নেতার মাজারের উল্টোদিকে, রাস্তার পাশে ফুটপাতের উপর তৈরি কংক্রিটের বেঞ্চিতে বসে লোকটা ওই ভাঙা আয়না টুকরার উপর মনোসংযোগ করে একাগ্রচিত্তে নিজের চেহারার নানা অংশ, নানা ভাবে দেখতে চেষ্টা করছে। বাম পা মাটিতে ঝুলিয়ে এবং ডান পা হাঁটুর কাছে ভাঁজ করে ক্যাঙারুর মতো বসে রয়েছে। তার মুখে দশ-বারোদিনের না কামানো দাড়ি। খোঁচা খোঁচা। মাথার চুল বেশ বড়। ময়লা। জটলা জটলা। স্নান হয় নি হয়ত দু'এক সপ্তাহ। দু'গাল কিছুটা ভাঙা। সারেঙ্গির মতো। দেহে অপুষ্টির ছাপ। পুষ্টিভবনের পাশে অপুষ্ট লোকটা বসে আছে কংক্রিটের বেঞ্চিতে। চোখ দু'টো বেশ খানিকটা গর্তের মধ্যে। দৃষ্টি ক্ষীণ। পাশেই একটা বস্তা। মাটিতে। কাগজ কুড়ানিদের যেমনটা থাকে। গায়ে ময়লা গেঞ্জি। ঠাহর করা যায় না লোকটা কে, কী বা কী করে? হতে পারে ময়লা বা কাগজ কুড়ুনে, পাগল কিংবা নেশাখোর বা অন্য কিছু। সেটা অবশ্য আলোচ্য বিষয় নয়। বিষয়– লোকটা নিমগ্নভাবে নিজকে দেখছে ওই ভাঙা আয়নায়। নিজকে না বলে নিজের চেহারা বা মুখমণ্ডল বলাই ভালো। আর একটু যথার্থভাবে বললে বলা উচিত মুখমণ্ডলের নানা অংশ বিচ্ছিন্নভাবে দেখছে। কখনও নাকের উঁচু অংশ, কখনও নাকের ছেঁদা, কখনওবা কপালের ব্রণ, কখনও ডান চোখের একটা অংশ, কখনও বাম চোখের একটা অংশ, কখনও নিচের পাটির দু'একটা দাঁত, কখনও উপরের পাটির দু'একটা দাঁত। কখনও হাঁ করে সামনে বের করে আনা জিভ বা আজন্ম ঝুলে থাকা আল্‌জিভের কোনো অংশ সে দেখছে। অনেকক্ষণ বসে কখনও চোখ বড় করে গোল গোল করে, কখনও ভ্রূ কুঁচকে চোখ ছোট করে, কখনও ঠোঁট দু'টো সুচালো করে লোকটা তার মুখমণ্ডলের নানা অংশ নিবিষ্টভাবে দেখছে।

আর আমি পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে লোকটাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি এবং অবাক হই লোকটা চোখের সামনে তুলে ধরা নিজের বাম হাতটার দিকে তাকিয়ে কী দেখে– তাই ভেবে। একটু খেয়াল হতেই দেখি লোকটার বাঁ হাতে আঙুলে ধরা এক টুকরা কাচ। কাচটাতে চোখ বুলাচ্ছে। তখনই খেয়াল হলো, ওটা আসলে কাচ নয়, ভাঙা এক টুকরা আয়না। লোকটা যাতে বিব্রত না হয়, তাই দ্রুত সরে যাই এবং কিছুটা হেঁটে গিয়ে দূর থেকে দেখতে থাকি। দেখতে থাকি না বলে পর্যবেক্ষণ করতে থাকি বলাটাই যৌক্তিক। লোকটা ভাঙা আয়নার টুকরায় নিজের চেহারার নানা অংশ দেখে দেখে মনের মধ্যে জোড়া-তালি লাগাচ্ছে; আর আমি লোকটাকে দেখছি। আমি লোকটাকে নিয়ে মনের মধ্যে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ অঙ্ক কষি। আর হিসাব মেলাতে চেষ্টা করি– এর হেতু কী? সরলাঙ্ক ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ে এবং ফলাফল প্রতিবার শূন্য হয়।

লোকটাকে চেনা চেনা লাগছে। মনে হয় আগেও দেখেছি। আগেও কোথাও দেখেছি। মনে করতে চেষ্টা করছি। মনে পড়ল। এই লোকটাকে সেদিন রাতে দেখেছি। সেদিন অবশ্য দক্ষিণ পাশে নয়। বাংলা একাডেমির উত্তর পাশে মানে (সমাজতন্ত্রের ভাষায়) বাম পাশে। সেদিন সে বামপন্থী ছিল, আজকে ডানপন্থী। পারমাণবিক শক্তি কমিশনের পাশে, রমনা কালী-মন্দিরের উল্টোপারে। একদিকে আণবিক শক্তি, অন্যদিকে আদ্যাশক্তি– দুই শক্তির মাঝখানে। একদিকে বিজ্ঞান, আর একদিকে বিশ্বাস– এই দু'য়ের মাঝখানে লোকটাকে দেখেছি সেদিন রাতে। রাত এগারো-সাড়ে এগারোটায়। সেদিনও পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এই লোকটার পাশ দিয়ে। নাকি আসলে এই লোকটার পাশ দিয়েই আমি সব সময় যাই? কিংবা আমি যেখান দিয়েই যাই এই লোকটাই সেখানে সেখানে সব সময় থাকে? কিংবা এই চেনা চেনা অদ্ভুত অচেনা লোকটা যে কিনা সব সময় ভাঙা আয়নায় আপনাকে দেখতে থাকে, সে আসলে সবারই আসা-যাওয়ার পথের ধারে থাকে। কখনও দেখা যায়, কখনও যায় না।

বিকেলে বেশ খানিকটা বৃষ্টি হয়েছিল। বাতাসটা ধোয়া-কাচা মশারির মতো। ফুরফুরে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখি একটা লোক হাঁটু গেড়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে নতজানু ড্রেনের কাছে। দেবতার কাছে নতজানু না হয়ে ড্রেনের কাছে নতজানু হবার কারণ অজানা। রহস্যে ঘেরা। মাটিতে শেজদা দেবার মতো করে উবু হয়ে রয়েছে দু'হাতে ভর দিয়ে। চারদিক সুনসান। আর কোনো জনমানুষ নেই। কোনো কুকুর, মস্তান, ছিনতাইকারী বা ভ্রমমাণ বেশ্যাও নেই। যাকে এক কথায় নির্জন বলা চলে। জানতে ইচ্ছে জাগল– লোকটা ওভাবে কী করছে ওখানে। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের নিয়ন বাতির মরা আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল ড্রেনের জলের উপরতলে ঠোঁট ছুঁইয়ে লোকটা চুমুক দিয়ে জল পান করছে তৃপ্তিতে। প্রশ্ন জাগল– ওভাবে কেন? দু'হাতের চেটো এক করে আঁজলা ভরেওতো জল পান করা যেত। আঁজলা ভরে খেলে জলটা হয়ত ঘুলিয়ে যেতে পারে ভেবেও ওভাবে জল পান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হতে পারে। যাহোক, পিপাসায় মানুষ এভাবে ড্রেনে মুখ লাগিয়ে কুকুরের মতো জল খেতে পারে বা জল খায়– তা প্রথম দেখলাম। না দেখলে অবশ্য বিশ্বাস করতাম না। ডাস্টবিন থেকে অবশ্য খাবার কিংবা মুরগির রান তুলে খেতে দেখেছি। কিন্তু এভাবে এই প্রথম কাউকে জল পান করতে দেখলাম। বৃষ্টির জমানো স্বচ্ছ জল, করতলে ধারণেরও স্পর্ধা নেই তার ঈশ্বরের দান।

এক সময় চোখ তুলে তাকাল লোকটা। আমাকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে একটু হেসে দিল। মনে হয় চেনা কাউকে দেখছে। লজ্জা পেল বলে মনে হয় না; তবে লজ্জা পাওয়ার মতো হাসল। এতে তার কাছে এগিয়ে যাবার সাহস পেলাম আমি। কাছে এসে দাঁড়াতেই হাসির মাত্রাটা একটু বেশি হলো। তার হাসিটা আকর্ণবিস্তৃত দন্তবিকশিত নয়, সশব্দও নয়; তবে বেশ একটু আয়েশি হাসি। তার হাসি দেখে মনে হলো পৃথিবী সৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই লোকটি হাসছে। যেন পৃথিবীটাই সৃষ্টি করেছে সে– এমনি অহমবোধ ও পরিতৃপ্তির হাসি।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞস করলাম– কী খবর, ভালো?

হাসিটা স্ট্যান্ডবাই রেখে মাথাটা ঝুঁকে বোঝাল– ভালো।

কিন্তু কোনো কথা বলল না। যেন কথা বলা বারণ। কিংবা কথা বলাটা অহেতুক। সে বসেই ছিল। বসেই থাকল। যেন বসে থাকাই তার কাজ। কড়ি নেই, কুবের নেই– আশ্চর্য এক যক্ষ। আমি দাঁড়ানো। দেখলাম, আয়নার টুকরাটা হাতে ধরাই রয়েছে। ওটা যেন মনের দুয়ার খোলার একমাত্র চাবি। হারালে চলবে না। কিন্তু মুখ-চর্চায় ছেদ পড়ল কিছুক্ষণ।

জিজ্ঞেস করলাম– কী ওটা?

– আরশি। মুখ দ্যাহা যায়।

– ওতে আর কী দেখা যায়?

– আলেদা আলেদা কইরে দ্যাহা যায়।

– তাতে কি আর চেহারা বোঝা যায়?

– যায়। জোড়া-তালি দিয়া মুখের এট্টা আলেদা কায়দা অয়। তাছাড়া–

– তাছাড়া?

– তাছাড়া, ভাঙ্গা আরশিতে মুখ দেখলি নাকি বুদ্দি বাড়ে। মরিয়ম কইছে।

– অন্য কোনো আয়নাতেও তো দেখতে পারো? দোকানের আয়না বা অন্য কোনোখানে।

– তাড়াইয়ে দেয়।

– তাই বলে এই আয়নায়? এতে কী দেখা যায়?

– দেখতি জানলিই দ্যাহা যায়। এই দ্যাহার মধ্যেও এট্টা মজা আছে। মরিয়ম কইছে।

– মরিয়ম কে?

– ছেলো একজন। অহোন নাই।

– মারা গেছে?

– হয়।

এরপর আর কথা চলে না। তার মধ্যে এক টুকরো শোকের বরফ জমা রয়েছে বোঝা যায়। তা নিয়ে ঘাটাঘাটি না করাই সঙ্গত মনে হলো। মনে হলো 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে'? কিছুটা নীরবতা। একটু হাল্কা বাতাস। দু'তিনটা পাতা ঝরা কিংবা ঝরাপাতার বিলাপ। মগডাল থেকে একটা কাকের পূরীষ পরিত্যাগ। তারপর কা কা করে উড়ে যাওয়া। এ সবই একটা আবেগঘন পরিবেশের মূল্যায়ন করে। তার ঠোঁটে কিন্তু গান্ধীমার্কা হাসি লেগেই। শোকের কোনো আভাস নেই সেখানে। কিংবা আছে ফল্গু নদীর শুষ্ক বালুর নিচে প্রবাহিত জলধারার মতো সঙ্গোপনে। সাদা চোখে দেখা যায় না। হাতের মুঠোয় মরিয়মের দর্পণ।

এ সময় শীতের গড়াই নদীর মতো চেহারার একটা মেয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়। তার ভাঁজে ভাঁজে চৈত্রের চর। ঝুর ঝুর বালির উড়াল যেন চুলের চেহারা। কোটরনিবাসী চোখ দু'টো যেন শালিখ পাখির ডিম। কয়লাখনির মজুরের মতো ছোপ ছোপ ময়লা শাড়ি। কোনো ভূমিকা না করেই বলে–

– ওরে আমার শাহরুখ খান, ইখানটায় বইসে আবার হেই ভাঙ্গা আয়নায় রূপ দশ্‌শোন করা হইচ্ছে? আর স্যারকে কিস্‌সা শুনানো হইচ্ছে? ভাঙ্গা আয়নার কিস্‌সা। ভাঙ্গা জীবনের কিস্‌সা।

অদ্ভুত হাসিটা হঠাৎ ব্রেককষা বাসের মতো একটা ধাক্কা খেয়ে আবার সচল। কোনো কথা বলল না। যেন কিছুই ঘটে নি এমনি নির্বিকার একটা ভাব বজায় রেখে সামনে পড়ে থাকা কাকের পূরীষটার দিকে মনোসংযোগ করল। যেন গভীর কোনো বিষয় পর্যবেক্ষণে রত। একভাবে তাকিয়ে থাকল। মনে হয় অনাদি অনন্তকাল ধরে এভাবেই তাকিয়ে রয়েছে বায়সের পূরীষের দিকে। নিবিষ্ট মনে। যেন পূরীষ রহস্য অনুসন্ধানই তার একমাত্র কর্তব্য। কারা এরা, কোথায় থাকে, কী করে, কী এদের পরিচয়, কী এদের সম্পর্ক– তা জানা নেই আমার। প্রশ্নের এক ঘূর্ণিজাল পাক খায় মনের মধ্যে। জিজ্ঞেস করলাম–

– তুমি কে? কী নাম তোমার?

– মরিয়ম।

ঠাস্ করে কে যেন গালে থাপ্পর কষিয়ে দিল। সে না মারা গেছে? লোকটার দিকে তাকাতেই দেখি মৃত মানুষের মুখের মতো হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে আছে। লোকটা কি জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে ঝুলন্ত পেন্ডুলাম? দুলছে? পূরীষ ছেড়ে দৃষ্টির তীর এবার আমার দিকে। কোনো প্রশ্ন অবান্তর। প্রশ্নগুলো মাছি হয়ে তার মুখে বসবে উড়বে কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না। রহস্যের যবনিকা ঘটায় মেয়েটি।

– সন্ধ্যার পরে আসবেন স্যার। ইখানে আসবেন। আমারও কিস্‌সা আছে। ভাঙ্গা আয়নার কিস্‌সা। ভাঙ্গা জীবনের কিস্‌সা। আন্ধার না হলি কি কিস্‌সা জমে? হক্কল জানতে পারবেন স্যার। এই আয়নায় চেহারা দেখা লোকটা মিছা কইছে, না ঠিক?

মগজটা খামচে ধরে অচেনা ভিমরুল। মাথামুণ্ডু কোনো তল পাই না এ কিস্‌সার। কী এই দর্পণ রহস্য? তার সাথে কী সম্পর্ক মরিয়মের? কে ই বা তারা?

চুম্বকের মতো কথাটা টানে আমাকে। সন্ধের পরে যাই। আদিম কোন্ অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে জায়গাটায়। ঠিক সেই বেঞ্চিতে অন্ধকারের মধ্যে আর একটা অন্ধকার হয়ে সেজে-গুজে মরিয়ম। নিভৃত এক পণ্য। অন্ধকারেও টের পাই মরিয়মের গালে ছোপ ছোপ কাশফুলের আঁচড়। হাতে নুড়ির আওয়াজ। ছাতিম ফুলের মতো একটা উগ্র গন্ধ অগ্নিমুখ ড্রাগনের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠে আকাশে। আমাকে জাপটে ধরে অচেনা এক চিতার ধোঁয়া।

– একশোটা ট্যাকা দ্যান স্যার। আমার ভিজিট।

অকস্মাৎ হাত ধরে টানে হিমশীতল মরিয়ম। মৃত মরিয়ম। তার হাতটাকে শক্ত পাথরের মতো মনে হয়। আমি শিউরে উঠি। দু'পা শক্ত কাঠ। রঙতামাশার হাতছানি। এ কোন্ কঠিন তামাশা?

– পার্কের ভিতর চলেন স্যার। সব জানতে পারবেন। ভাঙ্গা আয়নার কিস্‌সা। ভাঙ্গা জীবনের কিস্‌সা।

অন্ধকারটা হঠাৎ দুলে ওঠে। মনে হল আলকাতরার পাত্রে ইঁদুর পড়েছে। অদূরে দাঁড়িয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে ওঠে লোকটা, যে ছিল অদৃশ্য অথবা যে অদৃশ্যই থাকে– কইছি না, মরিয়ম মারা গেছে? মরিয়ম কইছে, ভাঙ্গা আরশিতে মুখ দেখলি বুদ্দি বাড়ে।

লোকটা ভাঙা দর্পণে মুখ দেখতে থাকে। অন্ধকারে। নিবিষ্টভাবে। আমার চারপাশে অবিরত অসংখ্য লোক মুখ দেখতে থাকে ভাঙা দর্পণে। আমার চারপাশে অসংখ্য লোক ড্রেনে মুখ দিয়ে জল পান করতে থাকে অবিরাম। আমার চারপাশে অসংখ্য মরিয়ম দাঁড়িয়ে তাদের ঠাণ্ডা শক্ত মৃত হাত দিয়ে টানতে থাকে আমাকে। আমি দৌড় দিতে চাই। পেছন থেকে টেনে ধরে অসংখ্য মৃত মরিয়মের হাত। চিৎকার দিতে চাই। পারি না। বাংলা একাডেমি, পুষ্টিভবন, তিন নেতার মাজার, আনবিক শক্তি কমিশন, রমনা কালীমন্দির– সবখানে টুক্‌রো টুক্‌রো ভাঙা আয়নার মিছিল। আর অগণিত 'লোকটা' অবিরত মুখ দেখছে তাতে। ভাঙা আয়নার মধ্যে মুখমণ্ডলের অসংখ্য টুক্‌রো-টুক্‌রো অংশ বিক্ষিপ্ত মিলেমিশে ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময় আকার ধারণ করে। বীভৎস চেহারায় আর্তনাদ করে।

তরল অন্ধকারে প্রেতাত্মার মতো একটা ছায়া কেঁপে কেঁপে ওঠে। পেছনে। উগ্র একটা গন্ধ নাকে এসে খামচি মারে আচমকা। আমি ফিরে তাকাই। আরেক বিস্ময়। অন্য এক নারী। অন্য এক পণ্য। জিজ্ঞেস করি–

– তুমি কে? কী তোমার নাম?

– মরিয়ম।

অন্ধকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাশ থেকে আবার সেই অদ্ভুত খ্যাঁক খ্যাঁক হাসি– 'মরিয়ম'!

আশ্চর্য! কাঁপা কাঁপা ছায়া ছায়া অন্ধকারের সমস্ত নারীদের নামই কি মরিয়ম হয়ে থাকে? সবারই কি থাকে ভাঙা আয়নার কিস্‌সা? ভাঙা জীবনের কিস্‌সসা? নাকি সব নকল? আমার দেখার ভুল?

লাশের নদী

সবে তখন সন্ধে। বাতাস প্রকম্পিত করে উন্মাদ শব্দ ধায় দিগ্বিদিক। দিশেহারা বাতাস গুলিবিদ্ধ। বাস্তবের আকাশে কোনো মেঘ নেই তবু বিজলি চমকায় ঘন ঘন। প্রকৃতপক্ষে তা মেশিনগানের আগুন অন্ধকার ঠিক্‌রে বেরয়। নৈঃশব্দের বুকে আতঙ্কের বীজ বোনে। আর অন্ধকারের বুকে আলোর আলপনা আঁকে। চোখে চমক লাগায়। আতঙ্ক মূর্তি হয়ে অট্টহাসি হাসে। ক্রূর এবং ভয়াল সে সময়টা জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানে পেন্ডুলামের মতো দোলে। সময়ও গুলিবিদ্ধ হয়। যেহেতু প্রাণ নেই সময় তাই কাৎরায় না। মানুষের মতো ছটফট করে না। সময় স্থির কিংবা অদৃশ্য চলে। সাতচল্লিশ কিংবা তারও আগে থেকে শুরু করে বায়ান্ন কিংবা ঊনসত্তর পরিভ্রমণ করে একাত্তরে এসে থামে। বর্বরতার সাক্ষী হয়। যদিও সময় মৃত অদৃশ্য বিদেহী আত্মার মতো। তবু সাক্ষী হয়।

গলিত একটা লাশকে আলিঙ্গন করে ভেসে রইল ডেভিড। ঠিক আলিঙ্গন নয়, জড়িয়ে। আঁকড়ে ধরে থাকল বন্ধুর মতো পরম নির্ভরতায়। লাশও বন্ধু হয় কখনও সখনও। ওই লাশটাই যেন তার আশ্রয়। শেষ ভরসা। নাকে মুখে হাতে মাখনের মতো না বলে পুঁজের মতো লাগছে লাশের গলিত শরীর বলাই ভালো। দুর্গন্ধ ভয়ঙ্কর। নরক যেন। পেটের নাড়িভুড়ি বেরিয়ে আসতে চায় লাফ মেরে। ঘৃণা কিংবা ভয় এখানে তুচ্ছ। ভেসে থাকল গলিত লাশের ক্লেদাক্ত পানিতে। লাশকে আঁকড়ে নিজেই লাশ হয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা কিংবা অপচেষ্টা। তাকেও লাশ ভেবে ঠোকর কাটে দু'একটা মাছ। গুলির ভয় তুচ্ছ করে মাছ করে খাদ্যের তালাশ। শতশত লাশের মধ্যে একমাত্র ডেভিডের দেহেই প্রাণ আছে। আর সব নিষ্প্রাণ। মৃত। গলিত। এ তত্ত্ব নিরর্থক মাছেদের কাছে। সবাইকেই লাশ ভাবে তারা। পাকসেনাদের কাছে যেমন সব বাঙালিই শত্রু। ব্লাডি।

আশ্বিন কার্তিক মাসে পানিতে পচন লাগলে বিলের ধানক্ষেতে পোটকা মাছ যেমন পচে ফুলে ভাসতে থাকে, সলধা নদীতে মানুষগুলো তেমনি ভাসছে। একটা দু'টো নয়, শয়ে শয়ে নয়, হাজারে হাজার। মানুষগুলো নয়, মানুষের শবগুলো। এ যেন লাশের মিছিল। শ্লোগানবিহীন নিঃশব্দ মিছিল। লাশের মিছিলে প্রতিদিন শামিল হয় আরও আরও লাশ। মাইলের পর মাইল জুড়ে বাতাসে পচা লাশের গন্ধ। শুটকি মাছের খোলার পাশ দিয়ে তবু হাঁটা যায়, এ নদীর পাশ দিয়ে হাঁটা যায় না। মানুষপচা গন্ধে নদী-তীরবর্তী এলাকা বীভৎস। লাশগুলো বিকৃত। গলিত, অর্ধ-গলিত এ লাশগুলো খুবলে খুবলে খাচ্ছে মাছ। শেয়াল, শকুন, কুকুর। যে যেমন পারছে। রাতে কিংবা প্রত্যক্ষ দিবালোকে। ভেসে থাকা লাশের উপর উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরাম করে খাচ্ছে কুকুর আর শেয়াল। নদী জুড়ে পতঙ্গের মতো উড়ছে শকুন। ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে মৃতের পচা-গলা শরীর। উড়ছে উল্লাসে। কখনও বিশ্রাম নিচ্ছে কিছুক্ষণ গাছের ডালে। এখানে কোনো মানুষ নেই। যারা ছিল, সবাই লাশ। যারা লাশ হতে পারে নি, তারা পালিয়েছে জন্মের মতো। 'এই মৃত্যু-উপত্যকা' তাদের দেশ নয়।

আলবার্ট ফিলিপ ব্যাপারীর বড় ছেলে ডেভিড। পাকিস্তানি আর্মির নজর পড়ল তার উপর। তাগড়াই যুবক। বুদ্ধি আছে। সাহস আছে। লেখাপড়াও জানে কিছুটা। তাকেই তাদের দরকার। হৃদয়টা শুধু নির্দয় আর নির্মম হওয়া চাই। এখানে কোনো সহানুভূতির জায়গা নেই, হতে হবে নিষ্ঠুর আর পাষণ্ড। কাজটা কঠিন কিন্তু জটিল নয়। মুক্তিবাহিনী আর হিন্দু বাড়িগুলো চিনিয়ে দেয়া। পথ-ঘাট দেখিয়ে তাদের সাহায্য করা। আর সুন্দরী মেয়েদের খোঁজ দেয়া। তাতে তার এবং তার পরিবারের সদস্যদের প্রাণ বাঁচবে। কঠিন সঙ্কটের মুখে ডেভিড। সেধে সেধে কেউটের লেজে পা। দাসত্ব, নয় মৃত্যু– বেছে নিতে হবে একটা। কঠিন পরীক্ষা। একই বৃন্তে অনেক কুসুম। মা-বাবা-ভাই-বোন। একার জন্যে সব হারাতে হবে। প্রাণ যাবে নিজেরও। হয় দেশ, নয় পরিবার। ইচ্ছের বিরুদ্ধেই দেশদ্রোহী। বন্ধু হয়েও শত্রুর আচরণ। মাথার ভেতর কেমন এক জটিল প্রতিক্রিয়া হয় তার। মগজের ভাঁজে ভাঁজে কিলবিল কেঁচো। অজস্র চিন্তার ডিগবাজি। মাথার ভেতর ঘুণপোকার বাস। শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ে আগুন। কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

যুদ্ধ শুধু দেশে নয়, ঘরেও। বাইরে নয়, অন্তরেও। ডেভিডের মনে যুদ্ধ। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায় অন্তর। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। দ্বন্দ্ব বাবা-মা'র। মা'র বারণ রাজি হতে। বাবার সম্মতি। অশান্তি চরম।

মা বলেন– কী ভেবেছিস্ তুই, কাজ শেষে তোকে ছেড়ে দেবে ওই পশুরা? কক্ষণও না।

বাবা বলেন– আশ্বাস যখন দিয়েছে, আশা তো করা যায়?

– আশ্বাসের কোনো দাম নাই ওই শয়তানদের কাছে।

– মরতে তো হবেই। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? তুই রাজি হ'।

কোনোভাবেই মন স্থির করতে পারে না ডেভিড। টু বি অর নট টু বি'র দ্বন্দ্ব। এ যেন শাঁখের করাত।

ছোট ভাই নাবালক। বোনেরা সামনে আসে নি। তীরবিদ্ধ কপোতীর মতো কাঁপছে ভিতর ঘরে। বাইরে অপেক্ষমাণ মূর্তিমান যমদূত। পাকসেনা। শেয়ালের চেয়ে ধূর্ত। হায়েনার চেয়ে হিংস্র। চিতার চেয়ে ক্ষিপ্র। আর জানোয়ারের চেয়ে নির্দয়। নিষ্ঠুর। উপায় কী? বাঁচার তাগিদেই রাজি হওয়া।

সারা গ্রাম যেন শ্মশান। আগুন নিভে গেলেও ধোঁয়া আর ছাই থাকে। আর থাকে ঘর-পোড়া ঘ্রাণ। দিনের বিভীষিকা জড়িয়ে থাকে রাতের শরীরে। প্রতিদিন পাকসেনা এক এক এলাকায় ঢোকে, লুট করে আর পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় সব। সোনা-দানা-টাকা-পয়সা যা পায় তুলে নেয়। জীবিত যাদের ধরতে পারে পিঠ বেঁধে নিয়ে আসে সলধার পাড়ে। কারো মুখে আতঙ্ক। চোখে মৃত্যুর বিভীষিকা। কেউ আর্তনাদ করে ওঠে। কেঁদে ওঠে হাউমাউ। কেউ ঈশ্বরকে ডাকে প্রাণপণে। বধির ঈশ্বর শোনে না তাদের আর্তি। নির্বিকার। স্কুলের সমাবেশের মতো সারিবদ্ধ দাঁড় করায়। যেন তখনি গাইতে বলবে 'পাক সার জমিন সাদ বাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ . . .'। কিন্তু গাইতে বলে না। সমাবেশের সারিটা দেখে। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি হাসে। উর্দুতে কিছু একটা বলে। নিয়ামত খানের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়– ফায়ার। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে বন্দুক। গুলি ঝাঁঝরা করে দেয় বুক। মাটির পুতুলের মতো কাৎ হয়ে পড়ে যায় গোটা সারি। এক গুলিতে দশ/বারো জন খতম। গুলি খেয়েও যদি কেউ কাৎরায় তাকে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারে। এরপর লাথি মেরে লাশগুলো ফেলে দেয় সলধার পানিতে। সলধা যেন মা-জননী। সন্তানকে টেনে নেয় বুকে।

বোতলা ঘাসের মতো আতঙ্ক গজিয়ে ওঠে সারা গ্রামে। তার সামনেই সেদিন পাকসেনারা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল স্কুলের দিদিমণিকে। কাঁটাতারে বেঁধা কাপড়ের মতো ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেল দিদিমণির শাড়ি-ব্লাউজ। পিশাচও দেখতে লজ্জা পায় সে দৃশ্য। সে বাধা দিতে পারে নি। কিচ্ছু বলতে পারে নি। সে ক্রীতদাসমাত্র। হুকুম তামিল করাই তার একমাত্র কাজ। দিদিমণি পড়াচ্ছিলেন– 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?' আহা, প্রিয় দিদিমণি। হেডমাস্টার সত্যেনবাবুর ঘরে ঢুকে সোজা গুলি ছুঁড়ে দিল তাঁর বুকে। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবিপরা সত্যেনবাবু যেন হোলিখেলায় ক্লান্ত এক তরুণ। ধপ্ করে পড়ে গেলেন মেঝে। পড়ে রইলেন মাটিতে। সাদা পাঞ্জাবিটা রক্তে লাল। ডেভিড শুধু সাক্ষীই নয় এ পাপযজ্ঞের, সে বিভীষণ।

বোটের চিপ নিয়ামত খানের হুকুম তামিল করাই ডেভিডের কাজ। কালকের অপারেশনের তালিকা তৈরি হয় আজকের রাতে। তারপর হুইস্কির গেলাসে চাপা পড়ে টেবিলের পাশে। সিগারেটের আগুনে পুড়ে ছাই হয় পরের সন্ধ্যায়। আবার নতুন তালিকা। আজকের টার্গেট অবিনাশ চক্রবর্তী। হাইস্কুলের শিক্ষক। দেশপ্রেমী। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। এলাকার যুবকদের যিনি উৎসাহিত করেন যুদ্ধে যেতে। ভোর থাকতেই অপারেশন শুরু। ডেভিডের জীবন-মরণ সমস্যা। অবিনাশবাবুর ছোটছেলে অনিমেষ ডেভিডের বন্ধু। মেয়ে অদিতিকে সে ভালোবাসে। ডেভিডের হাত-পা বাঁধা। নিজেরই নিজের কলজেটা ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয় ক্ষোভে দুঃখে যন্ত্রণায়। সে জানে, করার কিচ্ছু নেই তার। সে এখন অন্যের হাতের দাবার ঘুঁটি। স্থির ছবির মতো চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিচ্ছু করার নেই তার। বড় বিপন্ন সে। সে যেন পুড়তে থাকা অসহায় এক সলতে। তারই

পায়ের তলায় পিষ্ট অদিতির প্রেম। তার জীবনের বিনিময়ে যদি বাঁচানো যেত তাদের, সে আত্মাহুতি দিত। কিন্তু একই সুতোয় গাঁথা তার এবং তার পরিবারের সবার জীবন। সে অসহায়।

ভারি বুটের শব্দে খানখান ভোরের বাতাস। বিষণ্ন বিবর্ণ সকালের আলো। গাছে গাছে শঙ্কিত পাখিরা। উঠোনের মুরগিগুলো ছুটোছুটি করে দিগ্বিদিক। ওরাও যেন টের পেয়ে গেছে সর্বনাশের। চিৎকার চেঁচামেচিতে হুড়মুড় ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন অবিনাশবাবু। ছেলে অনিমেষ। একমাত্র মেয়ে অদিতি। বড়ছেলে অমিতেশ যুদ্ধে। উঠোনে পাকসেনা। সাথে ডেভিড। চোরের মতো দাঁড়িয়ে পেছনে। নীরব। নীরবতা ছাড়া আর কোনো প্রশ্রয় থাকে না এখানে।

কটূ কথা যার মুখে কেউ কখনও শোনে নি, তার মুখে বেরিয়ে আসে– নিমকহারাম!

দাঁত কটমট করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিচ্ছু করার থাকে না অবিনাশবাবুর। কলে-পড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করেন। কাঁপতে থাকেন। কোনো কথা যোগায় না মুখে।

ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে অনিমেষ– ডেভিড, তুই?

তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসে ডেভিডের। নিজেই নিজের শত্রু যেন সে।

পায়ের নিচের মাটি সরে সরে যায় অদিতির। বিস্ময়াহত হরিণীর মতো অদিতির কণ্ঠে অস্ফুট উচ্চারণ– হায় ঈশ্বর!

চিৎকার চেঁচামেচি বৃথা। প্রতিবাদ প্রতিরোধের চেষ্টা বৃথা। আগুনের কাছে খড়ের মিনতি অর্থহীন। হায়েনার কাছে হরিণার প্রাণভিক্ষা নিষ্ফল আবেদনমাত্র। চোখের জলের মূল্য এখানে একটিমাত্র বুলেট। আর অদিতি! সে তো হোমের আগুনে এক পশলা ঘি।

জ্বলন্ত অগ্নিকূণ্ডে নিক্ষিপ্ত ডেভিড যেন এক টুকরো লোহা। পুড়ে ছাই হয় না। আগুন হয়ে জ্বলে। সে নিরুপায়। তার কষ্ট কেউ বোঝে না। বোঝা যায়ও না। সে যে নির্দোষ, সে যে সময়ের সৃষ্টি, সে যে নিমিত্তমাত্র– কী করে তা বোঝাবে অদিতিকে? অবিনাশবাবুকে? কাউকে? সে নির্দয় নয়, বেইমান নয়। সে নিয়তির খেলার পুতুল। ভেতরটা ভস্ম হয়ে যায়। আর জ্বলে অসহ্য যন্ত্রণায়।

হিন্দু, মুসলিম আর খ্রিষ্টানের রক্তে লাল সলধার পানি। সলধা নদীর পানি লাল হয় আরেকবার। আরও একবার বাতাস প্রকম্পিত হয় মেশিনগানের গুলিতে। লাশের মিছিলে যোগ হয় আরও কয়েকটা লাশ। অদিতির ভাগ্য পাকসেনার হাতে। সেনা-ক্যাম্পে স্থান হয় তার। মৃত্যুর অতীত বিভীষিকা নিয়ে বেঁচে থাকে মৃত্যু নেই বলে। ডেভিড অদিতি একই বোটে। দূরত্ব অথচ পাথার পাথার। অদিতি এখন দূরের নক্ষত্র। দৃষ্টির বাইরে। 'শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ' অদিতির শরীর। বিশ্বাস ভেঙে ভেঙে খানখান হয়ে যায় অদিতির বিশ্বে। ডেভিড যেখানে এক নরকের কীট। বেইমান। বিশ্বাসঘাতক। চোরাস্রোতে ঘুরপাক খায় জীবন। মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর বেঁচে থাকা।

পাক আর্মির কাজ শেষ এ অঞ্চলে। তারা নিশ্চিত হয়েছে যে আর কেউ বেঁচে নেই এখানে। মুক্তিযোদ্ধাদের একটা দল নাকি ঢুকে পড়েছে গোপালগঞ্জে। ওখান থেকে খবর এসেছে। কাল ভোরে রওনা দেবে গোপালগঞ্জের দিকে। আজ উল্লাসের রাত। মক্ষীরানি অদিতি। এ অঞ্চলে একমাত্র ডেভিডের পরিবারই জীবিত রয়েছে। তার দুই বোন ক্লারা আর ক্যাথরিন। ক্লারা কলেজে। ক্যাথরিন ক্লাস টেন। তারা সসম্মানেই আছে। কারণ, ডেভিড। তাদের গাইড। কাল তাকে মুক্তি দেয়ার কথা। এতদিন আর্মির গাইড হিসেবে থাকলেও তাকে চোখে চোখে রাখা হতো যাতে পালিয়ে না যায়। আজও রয়েছে। দু'জন বন্দুকধারী তার প্রহরায় থাকে সবসময়। ব্লাডি বাঙালিকে বিশ্বাস নেই।

একটু আগেই, বাথরুমে যাবার সময়, সে জানতে পেরেছে, এখান থেকে আর্মি চলে যাবে কাল। এও শুনতে পেয়েছে, তাকে ছাড়া হবে না। গুলি করে ফেলে যাবে এই সলধাতেই। ডেভিড ছিল দাবার শেষ ঘুঁটি। প্রতিশ্রুতি প্রতারণা মাত্র। সহানুভূতি বলে কোনো কথা নেই পাকসেনাদের অভিধানে। তার দুই বোনকে তুলে

নিয়ে যাবে আর্মিরা তাদের ক্যাম্পে। এ কথা শোনার পর থেকেই খাঁচায় আগুনলাগা পাখির মতো ছটফট করছে ডেভিড। মগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে হয় চারদিক। বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে থাকে আপাদমস্তক– শালার নিমকহারামির বাচ্চারা? পারলে উড়িয়ে দিত তাদের বোটটা। জ্বালিয়ে দিত। কিন্তু সে সুযোগ তার নেই। নেই সামর্থ্যও। সে এখন নিজেই নিজের ফাঁসুড়ে। নিজেই এক বোমা যেন বিস্ফোরণের অপেক্ষায়। সে তাই পালাবার পথ খোঁজে। পালাবার পথ নেই। সব পথ রুদ্ধ এখানে। দু'জন সব সময় পাহারায় রাখে তাকে। মৃত্যুই একমাত্র সত্য এখন।

ডেভিডের পরিবারে ভাঙন। অশান্তি লেগেই আছে বাবা-মা'র।

– ডেভিড আর ফিরবে না। ফিরতে দেবে না ওকে। চলো পালাই আমরা।

– কী যে বলো? বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে পালাব? বললেই হলো? তা ছাড়া আমরা খ্রিষ্টান।

– খ্রিষ্টান মুসলমান বলে ওদের কাছে কিছু নাই। খ্রিষ্টান হই আর মুসলমান হই– আমরা বাঙালি। আর এই পরিচয়টাই ওদের কাছে মুখ্য। আর কেউ বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ এ গ্রামে।

– খারাপ কিছু হলে, এতদিনে হতো।

– কী আর খারাপ হবে এর চেয়ে?

– আমাদের তো কোনো সমস্যা হয় নাই?

বাবা হাল ছাড়ার পাত্র নয়। কী করার আছে ক্যাথরিন ক্লারা বুঝতে পারে না। নাবালক ভাইটা সবার মুখের দিকে তাকায়। সমস্যাটা বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু বোঝে না। শুধু বোঝে– ভয়ঙ্কর কোনো বিপদ বুঝি।

সলধার পানি আর লাল নেই এখন। আগে লাল ছিল। এখন কালো। সব লাশ পচে গেছে। এখন আর রক্তের চিহ্ন নেই। সন্ধে ঘনিয়ে এলো। সূর্য ডুববে। আজ আবার সলধার পানি লাল। রক্তে নয়। ডুবুডুবু সূর্যের আভায়। সূর্যটাও গুলিবিদ্ধ যেন। সূর্যের রক্তে লাল সলধার পানি। একটু পরেই অন্ধকার হবে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। সূর্য যখন ডুবে গেছে, চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, ডেভিড খেয়াল করল– বোটের ডেকের উপর কাছে তার মাত্র একজন প্রহরী। কিছুটা আনমনা। অন্যজন বাথরুমে। এই-ই সুযোগ। পেছন থেকে লাথি মেরে তাকে পানিতে ফেলে দিয়ে সে লাফ দিয়ে পড়ে গেল নদীতে। আর্মিটা সাঁতার জানে না। বালিভর্তি বস্তার মতো টুপ্ করে ডুবে গেল পানিতে। আর ডেভিড এক ডুবে যতদূর পারা যায় গিয়ে ভেসে উঠল। আবার ডুব দিল। আবার ভাসল। যেন এক আজব শুশুক। টের পেয়ে বোট থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়তে লাগল সাথে সাথে। খানখান হয়ে যায় নদীর নিস্তব্ধতা। স্রোতও যেন থমকে দাঁড়ায় ভয়ে। চিৎকার করে ছুটে পালায় মাংসভুক পিশাচেরা দূরে।

লাশের গায়ে গুলির মিছিল। ফুটো ফুটো হচ্ছে লাশের শরীর। ছড়ুড়ু ছড়ুড়ু শব্দে কেঁপে ওঠে সলধার পানি। কেঁপে ওঠে যেন সলধার লাশও। কেঁপে ওঠে রাতের অন্ধকার। শেয়াল, শকুন, কুকুর। কোনো মানুষ কাঁপে না। এ অঞ্চল জনহীন। কেঁপে ওঠার মতো আর কোনো মানুষ নেই অবশিষ্ট। বোটে অদিতি আর পানিতে ডেভিড। দু'জনই চেতনারহিত। তখনই গুলি বন্ধ হয় যখন আর্মি নিশ্চিত হয় যে ডেভিড বেঁচে নেই। পরিকল্পনা ছিল কাল সকালে ডেভিডের রক্তে সলধার পানি রাঙিয়ে তার বোনদের খোঁজে যাবে আর্মি। ডেভিড ছিল তাদের তুরুপের তাস। ভাগ্যের কী খেলা, কয়েক ঘণ্টা আগেই সে সুযোগ নিজেই এসে ধরা দেয় হাতের মুঠোয়। আর কালক্ষেপণ করা বৃথা মনে করে তারা রওনা হয় ডেভিডের বাড়ির দিকে। জেগে ওঠে পশুত্ব। মেতে ওঠে পৈশাচিক উল্লাসে। আজ রাত উন্মাদনার। সলধার শেষ রাত। লাশের নদীর শেষ রাত। বিজয়ের রাত। পানপাত্র আর হুইস্কির বোতলের ঝনঝনানি ডুবিয়ে দেয় অদিতির চুড়ির রিনিরিনি আওয়াজ। কিংবা কান্নার সুর।

আচমকা ছন্দপতন। বিনামেঘে বজ্রপাত। নেশা জমতে না জমতেই বিকট শব্দে দাউদাউ জ্বলে উঠল গোটা বোট। এই প্রথম আলোকিত হয়ে উঠল গোটা নদীটা। যেন হেসে উঠল সকল লাশ। ডেভিড স্তম্ভিত। সে যেন ভুলে গেছে লাশের ভিড়ে সে একা জীবন্ত লাশ। ব্লাডি বাঙালিকে বিশ্বাস নেই।

খুনি

ঘটনাটা বেশ অদ্ভুত। এমন ঘটনা সাধারণত বিদেশি গল্পেই ঘটে থাকে। সচরাচর ঘটে না। তখন বিকেল। বাসায় আর কেউ নেই। আমি একা। ডোর বেল বাজল। একবার। দরজা সাধারণত অন্য কেউ খোলে। বাসায় আজ কেউ নেই বলে আমিই গেলাম। দরজা খোলার আগে সাধারণত 'কে' বলে জিজ্ঞেস করে নেয়া হয়। আমি তাও করলাম না। খুলে দিলাম। অপরিচিত এক ব্যক্তি। মধ্য বয়সী। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পোশাক-আশাক পরিপাটি। ভদ্রজনোচিত। চেহারায় একটা আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে। ঠোঁটে মিষ্টি হাসি। স্মিত মুখে আদাব বললেন। আমিও সৌজন্যবশত আদাব বললাম।

বললাম– কাকে চান?

উত্তর দিলেন– আপনাকে।

– কোত্থেকে এসছেন?

– আগেতো ভিতরে আসতে দিন? বলছি।

দরজা খুলে ড্রইং রুমে নিয়ে গিয়ে বসতে বলে আমি আলো জ্বাললাম। বিকেলবেলা বলেই আবছায়া লাগছিল।

তিনি বললেন– আলোর দরকার নেই। ওটা নিভিয়ে দিন। এই আবছায়াটাই উপযুক্ত এ সময়ের জন্য। কেমন রহস্যঘন। রোমহর্ষক।

আলো নিভিয়ে দিলাম। পাশের সোফাটায় বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম– আপনি কে? কোত্থেকে এসেছেন? কী দরকার?

– ধীরে বন্ধু, ধীরে। এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? 'বৃক্ষ তোমার নাম কী, ফলে পরিচয়'।

– হেঁয়ালি করছেন কেন?

তিনি প্রশ্ন করলেন– আপনি মৃত্যুর কথা চিন্তা করেন?

বললাম– সে কে না করে?

– না, সে কথা নয়। সম্প্রতি কি মৃত্যুর কথা ভাবছেন? যে কোনো সময় আপনার মৃত্যু হতে পারে?

– সে তো ভাবছিই। যে কারো যে কোনো সময় মৃত্যু হতে পারে।

– না, তাও নয়। মানে, এই মুহূর্তে কি আপনি ভাবছেন যে একটু পরেই আপনি মারা যাবেন?

– না। কেন বলুনতো?

– মানে, আপনাকে মেরে ফেলা হবে? খুন করা হবে?

– খুন করা হবে? মানে? কে খুন করবে? কেন খুন করবে?

সহজ ভণিতাহীন উত্তর– আমি একজন খুনি। আপনাকে খুন করতে এসেছি। একটু পরেই আপনাকে খুন করব।

আমি তিড়িক করে লাফিয়ে উঠি। কী সর্বনাশ! বলে কী লোকটা? এ কি রহস্য, নাকি সত্যি?

– ভয় পাবেন না। ব্যস্ত হবেন না। হুটহাট আমি কাউকে খুন করি না। আমি একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনি।

– কী বলছেন আপনি? খুন করবেন মানে?

– এখনই নয়। একটু গল্প-সল্প করি। তারপর...

– আমার অপরাধ? আর আপনিইবা আমাকে খুন করবেন কেন? আপনার সাথে আমার কোনো শত্রুতা আছে?

– না, নেই। খুন করতে হলে শত্রুতার প্রয়োজন পড়ে না। আমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি আপনাকে খুন করব। ব্যস।

– ইচ্ছে হলেই কি কেউ কাউকে খুন করতে পারে?

– পারে। দেখুন না, এখনই। একটু পরেই তার প্রমাণ পাবেন।

পকেট থেকে পিস্তল বের করলেন। তার মুখে তখনও মৃদু হাসি। আমার মুখ পাংশু। কী করব, বুঝে উঠতে পারছি না। এ কোন্ উটকো ঝামেলা বাবা। বাসায় কেউ নেই। বোকার মতো কিছু জিজ্ঞেস না করেই দরজা খুলে দিয়েছি। মোবাইলটা হাতে নিলাম। স্ত্রীকে ফোন করে দেই...

– না। ফোন করবেন না। ফোনটা এদিকে দেন। কথা যা আমার সাথে। এক্ষুণি মারছি না আপনাকে। কিছুক্ষণ গল্প করব। তারপর। ভাববেন না। কোনো কষ্ট হবে না। আমার হাতের টিপ খুব ভালো। কয়েক সেকেন্ডমাত্র। তারপর শান্তি। আচ্ছা, শান্তি সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? মানুষ কি কখনও শান্তি পায় আদৌ? নাকি ফালতু টার্ম?

– কেন পাবে না?

– আপনি পেয়েছেন? কেউ পেয়েছে? নাকি শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে সবাই? নাকি শান্তি পাওয়ার অভিনয় করে যাচ্ছে মানুষ?

– পিস্তলটা নামান। ওটা ধরা থাকলে সব গুলিয়ে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। একটু জল খেয়ে আসব?

– অবশ্যই। মৃত্যুপথযাত্রী কি জল পান করবে না? তবে সাবধান, কোনো রকম ভণিতার আশ্রয় নেবেন না। চিৎকার চেঁচামেচি এসব আমার পছন্দ নয়। কাউকে কিছু বলতে যাবেন না। মরবেন তো শান্তিপূর্ণভাবে মরুন। কাওয়ার্ডের মতো মরবেন না।

– তাতো বটেই। আপনি নিশ্চিত থাকুন। আপনিও কি জল খাবেন এক গেলাস?

– তা দিতে পারেন। বিকেলবেলা একটু চা হলেও মন্দ হতো না। আপনি চা বানাতে পারেন?

– বানাইনি কখনও। চেষ্টা করে দেখতে পারি।

– টোস্ট আছে ঘরে? সাথে দু'পিস্ টোস্ট।

– আছে মনে হয়। বাটার দেব?

– না, থাক। শুধু টোস্ট।

একটু পরেই দু'গেলাস জল। দু'কাপ চা। আর চারটে টোস্ট নিয়ে এলাম। বসে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম আর চা-টোস্ট খাচ্ছিলাম আমার হবু খুনির সাথে। পিস্তলটা শুয়ে ছিল সেন্টার টেবিলে। মৃতের মতো। ঠাণ্ডা হয়ত। ওটার মধ্যে গুলি আছে হয়ত। একটু পরেই তা ঢুকে যাবে আমার শরীরে। তারপর আমি অতীত। ছবি হয়ে ঝুলে থাকব দেয়ালে। খড়্খড়ে শুকনো মালা দুলতে থাকবে ফ্রেমের কাচের ওপর। ছবিটা কোন জায়গায় টাঙালে শোভা পায়, তা দেখছিলাম তাকিয়ে তাকিয়ে। বড় দেয়ালটার মাঝখানেই ভালো মানাবে। হঠাৎ মনে হলো– এ সব আমার ভেবে কী লাভ? আমি কি আর ছবি টাঙিয়ে যেয়ে মরব, নাকি মরার পরে ছবি টাঙাতে আসব? যারা বেঁচে থাকবে, তারা ভাববে এ সব নিয়ে। কিংবা নাও ভাবতে পারে। এ সব একান্তই তাদের ব্যাক্তিগত ব্যাপার।

– কী ভাবছেন? পালানোর পরিকল্পনা করছেন? চেষ্টা করে দেখুন না?

– না। ও সব না। চেষ্টা করেও লাভ নেই, তা বুঝতে পারছি।

– উপায় নেই জেনেও তো মানুষ চেষ্টা করে? আপনি নয় কেন?

– আমি অন্যদের মতো নই বলেই।

– পালাবেন না, তাহলে?

– না।

– গল্প হোক তাহলে?

– হোক।

– কথা হচ্ছিল শান্তি নিয়ে। শান্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

– এই যে আপনার সাথে কথা বলছি, আমি শান্তি পাচ্ছি। এই যে চা খেতে খেতে গল্প করছি, শান্তি পাচ্ছি। এই যে টোস্টে কামড় দিচ্ছি, কুড়ুমুড় শব্দ হচ্ছে, আমি উপভোগ করছি। শান্তি পাচ্ছি। এই যে শুয়ে আছে পিস্তলটা, তার গুলিটা একটু পরে আমার মগজের মধ্য দিয়ে ঢুকে যাবে– ঠাণ্ডা হয়ে যাব। শান্তি। যে কেউ যে কোনো বিষয় নিয়ে যে কোনো সময় ইচ্ছে করলেই শান্তি পেতে পারে।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। ওটা তার হাতেই ছিল।

– আপনার স্ত্রী। বেশ মিষ্টি। কথা বলুন। সাবধান! উল্টোপাল্টা কিছু বলবেন না। স্পিক ফোন দিয়ে দিচ্ছি।

– হ্যালো।

– ঘুমোও নি? কী করছ একা একা? শোন, আমাদের ফিরতে একটু দেরি হবে। একটু চা করে খাও।

– খাচ্ছি। চা আর টোস্ট।

– আচ্ছা। কেউ এসেছে? তুমিতো একা কখনও চা বানিয়ে খাও না?

– খাই না। আজ খেলাম। আমার এক বন্ধু এসেছে।

– কে? অরিন্দমদা?

– না। তুমি চিনবে না।

– আচ্ছা। ফ্রিজে মিষ্টি আছে। বের করে দাও। আর ঝুড়িতে ফল আছে। কেটে দিও।

– আচ্ছা।

– বাই।

– বাই।

– আপনার স্ত্রী খুব অতিথি-পরায়ণ, তাই না?

– হ্যাঁ। আমি মিষ্টি আর ফল নিয়ে আসি। বসুন।

একটু পরেই মিষ্টি, ফল আর ফল কাটার ধারাল একটা ছুরি নিয়ে হাজির হলাম। ফল কাটার অছিলায় যদি গলায় ঢুকিয়ে দেয়া যায়। একটা চান্স নেয়া যেতে পারে। আশ্চর্য! ছুড়িটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন– ফন্দিটা তো মন্দ নয় আপনার। ফল কাটার উছিলায় আমার গলায় ঢুকিয়ে দেয়ার ধান্দা। ভালো মতলব। কিন্তু সে সাহস আপনার নেই। পারবেন না। ঝট্ করে পিস্তলটা তুলে আমার মাথায় ঠেকিয়ে দিলেন– এবার আর চান্স দেয়া ঠিক হবে না। প্রস্তুত হন। আচ্ছা, কোথায় গুলি খেতে চান আপনি?

– মিষ্টি খাবেন না? আমার স্ত্রী...

– ও, তাই তো? বেশ। ঠিক আছে, তাড়াহুড়োর দরকার নেই। গল্পের এখনও বাকি...

– আচ্ছা।

– আমার ঘুমঘুম পাচ্ছে। একটু চোখ বুঁজি। আপনিও একটু আরাম করে নিন। তারপর কথা হবে আবার। আর সবশেষে হবে ফাইনাল খেলা। নিন, শুয়ে পড়ুন। আমি সোফাতেই কাৎ।

পিস্তলটা টেবিলের উপরই পড়ে থাকল। লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তা অবশ্য নিশ্চিত করে বলা যাবে না। ঘুমের ভান করেও পড়ে থাকতে পারে। বিশ্বাস নেই। অতএব, না ঘুমিয়ে মটকা মেরে পড়ে থাকাই ভালো। নিশ্চিত মৃত্যু জেনে মৃত্যু ভয়টা অনেকটা কমে গেছে। কেমন শান্তি শান্তি লাগছে। ভালোই হলো।

কলিং বেলের শব্দে তন্দ্রা টুটে গেল। উঠে বসে চোখ রগড়াচ্ছি। আশ্চর্য, লোকটা কোথায়? আমার খুনি? নেই। আমার স্ত্রী এবং সন্তান আমার সামনে। দরজা খুলল কে? ওই লোকটা নয় তো!

– কী ব্যাপার, তুমি দরজা খোলা রেখেই ঘুমিয়েছিলে নাকি? কলিং বেল চাপার পরে দেখি দরজাতো খোলাই রয়েছে? তোমার যা ভুলো মন? যদি চুরি-টুরি হয়ে যেত?

ব্যাপারটা বুঝলাম না। তাকিয়ে দেখি, সেন্টার টেবিলের উপর পিস্তলটা শুয়েই আছে। খুনি নেই।

রাজাকার

(বিধান চন্দ্র বিশ্বাস শ্রদ্ধাস্পদেষু)

লোকটা নড়ছেও না, গুলিও ছুঁড়ছে না। অস্ত্রটা উঁচিয়েও ধরছে না। রাইফেলটা লাঠির মতো ধরে কাকতাড়ুয়ার মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আধো আলো আধো অন্ধকারের আবছায়ায়। যেমনি দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনিই থাকল। স্থির ছায়ামূর্তি। যেন কোনো প্রাচীন ভাস্কর্য অচেনা অন্ধকারের। এমন সঙ্কটেও মানুষ পড়ে? বুকের ভেতর বুনো আতঙ্ক নিঃশব্দে চিৎকার করে। দম বন্ধ হয়ে আসে। গলায় যেন আটকে আছে শুকনো মাটির ঢেলা। আমি প্রস্তুত। অস্ত্র সজ্জিত। সে বন্দুক তাক করার সাথে সাথেই ট্রিগার চেপে দেব। কিন্তু আক্রমণ না করলে তো আগে আগে কিছু করতে পারি না। শুধু শুধু কাউকে খুন করা যুদ্ধের ধর্ম নয়। তাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ট্রিগারে হাত। বুকে অদ্ভুত এক উৎকণ্ঠার শীতল পারদ ছলকায়। তার উদ্দেশ্যও বোঝা যাচ্ছে না। রাজাকার ক্যাম্পের পাহারাদার যেহেতু, এটা বোঝা যাচ্ছে, সে একজন রাজাকার। কিন্তু মতলবটা বোঝা যাচ্ছে না। কী বিপদ আছে কে জানে? মুহূর্তগুলো বিভীষিকাময়। প্রতিটা মুহূর্ত বিষাক্ত সাপের ছোবল-আশঙ্কাক্লিষ্ট ফণার মতো ভয়াল।

কুলিয়ারচরের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ইন্ডিয়া থেকে আমরা ফিরছিলাম কসবা বর্ডার হয়ে কিছু গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা। উদ্দেশ্য কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম। সেখানে অবস্থিত মিলিটারিদের একটা গানবোট ধ্বংস করা আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা চার জন নেভাল কমান্ডো– আমি, টেকেরহাটের আলি আহমেদ, মাদারীপুরের শাহাবুদ্দিন এবং খুলনার আব্দুর রহিম। গেরিলা বাহিনীর দেড়শো সদস্য আমাদের সাথে। আমি ছিলাম টিম লিডার। অস্ত্রবিদ্যায়, নির্দেশনায় আমার দক্ষতায় তাদের বেশ শ্রদ্ধা ছিল। তাই বেশ সমীহ করত তারা। ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে চলছি আমরা সরীসৃপের মতো ছোট ছোট কতগুলো নৌকোয়। মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে হাইওয়ে। রাতের অন্ধকারে পাড়ি দিতে হবে রেলওয়ে ব্রিজ। মিলিটারি জিপ টহল দিচ্ছে ব্রিজের উপর দিয়ে। শব্দ করে রাস্তা কাঁপিয়ে অন্ধকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়, একটু পরেই আবার ফিরে আসে। পাশেই রাজাকার ক্যাম্প। এখান দিয়েই যেতে হবে আমাদের। অন্য কোনো পথ নেই। বেশ কিছুটা জায়গা পেরুতে হবে সন্তর্পণে। নৌকোয়। একসাথে কয়েকজন করে পার হচ্ছে। ভাগে ভাগে। আমি সবার শেষে যাব সঙ্গত কারণেই। অন্ধকার পাতলা হয়ে আসে। ভোর হতে আর বাকি নেই। রাত্রির কালো পর্দা ছিঁড়ে একটু পরেই পুব আকাশ রাঙিয়ে উঠবে নতুন দিনের রক্তিম সূর্য।

শেষ নৌকোয় আমরা মাত্র চারজন। পরনে গেঞ্জি, হাফপ্যান্ট। একটা বস্তার মধ্যে চারটে স্টেনগান। এক এক জনের কাছে তিনটা করে ম্যাগজিন। প্রতিটা ম্যাগজিনে ত্রিশটা করে গুলি। আর গোটা চারেক করে গ্রেনেড। এ সব একটা বস্তার মধ্যে। বুঝতে পারি নি রাত তখন প্রায় শেষ। পুব দিক লাল হয়ে উঠেছে। ফিকে হয়ে আসছে অন্ধকার। বাকি জায়গাটা পেরুতে পেরুতে চারদিক ফর্সা হয়ে যাবে। সামনেই রাজাকার ক্যাম্প। বুঝতে পারছি না কী করা যেতে পারে। কোথাও কোনো লোকজন তখনও দেখা যায় নি। মনে হলো ক্যাম্পের সবাই ঘুমিয়ে। এটাই ভরসা। হঠাৎ ব্রিজের কাছে মাটি ফুঁড়ে দাঁড়াল একটা লোক। ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। এখন উপায়? ওখানেইতো রাজাকার ক্যাম্প। নিশ্চই ও রাজাকার। আরও কাছাকাছি চলে এসেছি ততক্ষণে। দেখি লোকটার হাতে একটা লাঠি। শ'খানেক গজ দূর পৌঁছেই বুঝতে পারলাম ওটা আসলে লাঠি নয়, রাইফেল। ভয়ে রক্ত হিম হয়ে আসে। ঝট্ করে একটা স্টেনগান বের করে নৌকার গুঁড়ার উপর রাখলাম। একটা ম্যাগজিন ভরে রেডি করে রাখলাম। আর দু'টো ম্যাগজিন প্যান্টের ভেতর ঢুকিয়ে নিলাম। মাথার চুল খাড়া। চল্লিশ/পঞ্চাশ গজ দূরত্ব থাকতেই নৌকার মাঝি সাদেক বলল– 'কী করেন, কী করেন, বিপদ ঘটাবেন। ওটা বস্তার মধ্যে ঢুকান। চুপ করে থাকেন। কিচ্ছু হবে না'। আমার বিশ্বাস হলো না। সাদেক বলল– 'ওগুলা বস্তার মধ্যে ঢুকান। নইলে বিপদ হবে'। আমি কথাটায় গুরুত্ব দিলাম না। আগে প্রাণ বাঁচানো ফরজ। নৌকাটা আরও কাছে চলে এল। কিন্তু লোকটা লাঠির মতো রাইফেলটা ধরেই রয়েছে কিন্তু উঁচিয়ে

ধরছে না। তাক করছে না। সে তাক না করলে আমি কিছুই করতে পারছি না। আমি ভাবছি সে রাইফেল তাক করলেই আমি ঝট্ করে গুলি চালিয়ে দেবো। কিন্তু সে কিছুই করছে না। আমি বুঝতে পারছি না কী করব। ব্রিজের কাছেই লোকটার একেবারে কাছে চলে এসেছি। সে নির্লিপ্ত। যেমনি রাইফেল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি দাঁড়িয়েই থাকল। স্থির। পুব দিগন্ড় আরও রক্তিম হয়ে উঠল। ভয়ে হাত-পা কাঠ। কোনো বোধ কাজ করছে না। বুঝতে পারছি না কী করা উচিত। যা ভাবি নি হঠাৎ সে তাই করে বসল। অকল্পনীয় এ কাণ্ডে আমরা হতবাক। একেবারে তার কাছাকাছি আসতেই বাঁ হাতে রাইফেল ধরে এ্যাটেনশন করে ডান হাত তুলে সে স্যালুট করল। আমরা হতভম্ব। যার গুলি ছোঁড়ার কথা, সে স্যালুট করে বসল। আমরা বিস্ময়াস্তব্ধ। এটা তার কৌশল কি না, তা-ও বুঝতে পারছি না। হঠাৎ যন্ত্রচালিতের মতো আমিও স্যালুট করলাম। কিন্তু সচেতন থাকলাম পরিস্থিতির জন্য। ব্রিজ পেরুনো পর্যন্ত তার হাত কপালে ঠেকানোই থাকল। নির্বিঘ্নে আমরা ব্রিজ পেরিয়ে গেলাম। কিছুই ঘটল না। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সময় লাগল বেশ কিছুটা।

সাদেক বলল– 'স্যার, এরা রাজাকার, কিন্তু কাউরে মারে না। যারা এ পথ দিয়া যায়, তাগো কাছ থিইক্যা জনপ্রতি চার আনা কইর‍্যা নিয়া ছাইড়্যা দেয়। যাগো কাছে পয়সা থাকে না, তাগো এমনিতেই ছাইড়্যা দেয়। আর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থিইক্যা কোনো পয়সা নেয় না। উল্টা নিরাপদে ওপারে পৌঁছানোর ব্যবস্থা কইর‍্যা দেয়। এ দলে আমার পরিচিত লোক আছে। চাচাতো খালাতো ভাই আছে। গ্রামের লোক আছে। আমার নিজের ভাইও আছে। এইজন্যিই কইছিলাম, ভয় পাবেন না। কিচ্ছু হবে না। এরা ভালো রাজাকার। আমাগো গ্রাম পাকিস্তানি আর্মি থিইক্যা রক্ষা করার জইন্যে হগলে মিল্যা মিটিং কইর‍্যা ভাগ ভাগ কইর‍্যা দেয় যে, এরা আওয়ামী লীগ করবে, এরা মুসলিম লীগ করবে, এরা মুক্তিযোদ্ধা অবে, আর এরা রাজাকার অবে। আসলে এ গ্রামের হগলেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক। হগলেই ভিতরে ভিতরে এক। বাঁচার জন্যে এইডা একটা কৌশল। এ জায়গার সব রাজাকার ভালো রাজাকার'। সাদেকের কথায় বিস্মিত হলাম। রাজাকাররা খারাপ বলেই জানতাম। জানা ছিল না যে ভালো রাজাকারও থাকে। রাজাকারও ভালো হতে পারে।

নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেলাম রেলওয়ে ব্রিজ, রাজাকার ক্যাম্প। রায়পুরের বেলাব বাজারের বিপরীত দিকে 'পাকিস্তান বাজার'। বাজারের পাশে প্রাইমারি স্কুল। বন্ধ। ছাত্ররা আপাতত মৃত্যুর প্রহর গোনে। স্কুলে গেরিলা ক্যাম্প। পাশেই ব্রহ্মপুত্র নদ। সেখানে পৌঁছে জানতে পারলাম গেরিলারা রাজাকারদের ধরে ধরে নিয়ে এসে বেঁধে রেখে দেয়। খেতে দেয় না। জলও স্পর্শ করতে দেয় না। তিন-চার দিন পর কয়েকজন রাজাকার জমলে, পাঁচ-সাত জন হলে, তাদের প্রত্যেকের হাত দু'টো পেছনে বেঁধে এবং পা দু'টো এক করে বেঁধে ব্রহ্মপুত্র নদে ঠেলে ফেলে দেয়। প্রথমে কিছুক্ষণ সাঁতরাতে চেষ্টা করে। কিংবা কচুরিপানা কামড়ে ধরে বাঁচার আকুতিতে। তারপর ডুবে যায়। আমরা বুঝাতে চেষ্টা করলাম যুদ্ধ মানেই মানবতার বিপর্যয় নয়। মানুষ খুন নয়। ইন্ডিয়ান আর্মি রাজাকারদের খুন করা পছন্দ করে না। তারা বলে– Don't kill Razakar. রাজাকাররা সবাই খারাপ লোক নয়। ভালো রাজাকারও আছে। দায়ে পড়ে অনেক সময় অনেকে রাজাকার হয়েছে। কেউ কেউ কৌশল হিসেবে বেছে নিয়েছে রাজাকার হওয়া। এদের মধ্যেও দেশপ্রেম আছে। তাছাড়া এরা শোধরাতেও পারে। তাই এদের মারা যাবে না। বরং চেষ্টা করা যেতে পারে তাদের ফিরিয়ে আনতে। মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কাজে লাগাতে। আমরা চলে গেলাম না। ক্যাম্পেই থেকে গেলাম।

ইতোমধ্যে আমাদের কাছে খবর এল এলাকার বিশিষ্ট ধনী মুসা মিয়ার পেট্রোল বার্জ ডুবাতে হবে। শহর থেকে বার্জ ভরে পেট্রোল আসে মিলিটারি জিপে ব্যবহারের জন্য। পেট্রোল সাপ্লাই বন্ধ হলে মিলিটারি জিপ চলতে পারবে না। তাই পেট্রোল সাপ্লাই বন্ধ করার জন্য বার্জটা ডুবিয়ে দিতে হবে। এ কাজের জন্য যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সে জন্য কিছুদিন থাকতেও হবে। আমরা চার জন চার বাড়িতে থাকব। শরণার্থী হিসেবে থাকব। গোপনে তথ্য সংগ্রহ করব। এলাকার সবচেয়ে প্রভাবশালী মৌলভিবাড়ি। মুসা মিয়ার বাড়ি। পেট্রোল বার্জের মালিক। আমি থাকার জন্য সেটাই বেছে নিলাম। জঙ্গলে বাঘের গুহায় আশ্রয় নেয়াই সবচেয়ে নিরাপদ। কারণ, বাঘ ছাড়া অন্য কোনো ভয়ের কারণ থাকে না সেখানে। মুসা মিয়া মুসলিম লীগের নেতা।

তার বাড়িতে থাকলে সে অন্তত মিলিটারিদের আমাদের খবর জানাবে না। তাহলে গেরিলারা তাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তাছাড়া পেট্রোলভর্তি বার্জের যথাযথ তথ্য ওখানেই পাওয়া যাবে। মুসা মিয়ার বাড়িতে গিয়ে থাকার প্রস্তাব দিলাম। তারা আমাকে সাদরে থাকতে দিলেন। তাদের বাড়িতে একটা ঘরে আমার থাকার জায়গা হলো। অন্য তিনজন আশেপাশের তিনটা বাড়িতেই আশ্রয় নিল।

মুসা মিয়ার স্ত্রী কখনও সামনে আসেন নি। তাকে দেখতে পেতাম না। কথা শুনতাম। বেড়ার ওপাশ থেকে কথা বলতেন। ভারি কণ্ঠস্বর। আভিজাত্য আছে। রমজান মাস। ভোরবেলা উঠে তাদের সাথে আমার সেহ্‌রি খেতে হবে। আমি খেতে চাইতাম না। কিন্তু কোনো উপায় নেই। বেড়ার ওপাশ থেকে ঠিকই বলতেন– 'বাবা, খাও। তুমি না খেলে আমি খেতে পারি? তুমি না খেলে আমি খাব না। খেয়ে নাও'। এই মায়াভরা নির্দেশ উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। সকালে আবার নাশ্‌তা। পরোটা ভাজি ডিম পোচ। চা। রীতিমতো অত্যাচার। কিন্তু বেড়ার ওপাশ থেকে ঠিকই মৃদু অনুশাসন– 'ছেলে ছোকরা মানুষ খেতে চাচ্ছ না কেন? রান্না কি ভালো হয় নাই? না খেলে তোমার কষ্ট হবে। তোমার মা খেতে দিলে তুমি কি খেতে না? মায়ের কথা ফেলতে পারতে?'। রীতিমতে হুকুম। অগত্যা খেতেই হতো। ওখানে বিশ-পঁচিশ দিন থাকতে হয়েছে আমাদের। তাদের ছোট ছেলেটার বয়স সাত কি আট বছর। সে আমাকে মুসলমান বানাবেই। নানাভাবে চেষ্টা চালায়। আমি বলি– মুসলমান হলে লাভ কী?

সে বলে– হুরি পাবেন।

বলি– হুরি মানে কী?

সে বলে– তা আমি জানি না। তবে খুব সুন্দর জিনিস। পৃথিবীতে পাওয়া যায় না।

– কোথায় পাওয়া যায়?

– বেহেশতে পাওয়া যায়। আপনি মুসলমান হলে অনেক হুরি পাবেন।

– আর কী কী পাওয়া যায়?

– অনেক কিছু পাওয়া যায়।

সময় কাটানোর জন্য আমি তার সাথে গল্প করতাম। তাকে মাঝে সাজে অঙ্ক ইংরেজি বিজ্ঞান পড়াতাম। ক'দিনের মধ্যে পরিবারটির সাথে কেমন যেন একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়ে গেল। পর্দানশিন এক মুসলিম মহিলা হিন্দুর ছেলেকে নিজের ছেলের মতো এতটা স্নেহ করবেন, আদর-যত্ন করবেন, তা একেবারেই চিন্ড্রার বাইরে। তাও মৌলভিবাড়ি। মুসলিম লীগের নেতার স্ত্রী। কেমন এক মায়ার সম্পর্কে জড়িয়ে গেলাম।

ক'দিন বাদে ওবাড়িতে এসে হাজির পেট্রোল কোম্পানির দু'জন লোক। তারা খবর পেয়েছে মুসা মিয়ার পেট্রোল বার্জ ডুবিয়ে দেয়ার পরিকল্পনার। তারাও আমার মতো ওবাড়িরই অতিথি। তারা আমাকে বলে, এলাকায় নাকি ফ্রগম্যান এসেছে পেট্রোল বার্জ ডুবিয়ে দেয়ার জন্য। তাদের কাছে ইসরায়েলের দেয়া শক্তিশালী লিম্পেড মাইন আছে। বার্জটা ডুবিয়ে দিলে পেট্রোল কোম্পানির বিরাট লোকসান। বার্জ মালিকের কোনো লোকসান নেই। বীমা করা আছে। তাই তারা আসছে নেভাল কমান্ডোদের সাথে আলোচনা করার জন্য। কিন্তু তারা তাদের চেনে না। আমরা কোনো সন্ধান দিতে পারি কিনা জানতে চায়। চোরের কাছেই চোরের খোঁজ। এ বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না বলে জানালাম। বেশ কয়েকদিন একই সাথে থাকতে থাকতে তাদের সাথেও কেমন বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এর পরে আর বার্জটা ডুবানো সম্ভব হলো না। কী এক বোধ বাধা দিল। আমরা আমাদের পরিকল্পনা ত্যাগ করলাম। আমাদের কাছে খবর এল, ইতোমধ্যে অষ্টগ্রাম থেকে গান বোটটি সরিয়ে নেয়া হয়েছে। কী আর করা? এবার ফেরার পালা।

আশুগঞ্জের সাইলোতে আর্মি কোয়ার্টার। এখান থেকে ট্রেনে করে আর্মি গোলাবারুদ নিয়ে কিশোরগঞ্জ ময়মনসিংহ হয়ে চলে যায় বাহাদুরাবাদ ঘাট পর্যন্ত। পথে রেলওয়ে কালভার্ট। এলাকার লোকে বলে ছয়শতি ব্রিজ। এই ব্রিজ ছিল এ এলাকার ত্রাস। পাকিস্তানি আর্মি এ পথেই এলাকায় ঢোকে। মুক্তিযোদ্ধারা এ ব্রিজটি

উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করল। কয়েকজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা একটা নৌকায় করে বেশ কয়েকদিন চেষ্টা চালায় ব্রিজটি ধ্বংস করতে। ব্যর্থ হয়। বেলাবো বাজারে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প। যখনই তারা নৌকায় করে রাতের অন্ধকারে ব্রিজের দিকে যাবার চেষ্টা চালায় তখনই বেলাবো বাজারের ক্যাম্প থেকে গুলি ছোঁড়ে। ওরা জানে না যে ওটা গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের নৌকা। গেরিলাদের কাছে প্রায় ২৮০ কে.জি. বিস্ফোরক। ২০০ কে.জি. প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, টি.এন.টি. দুই বাক্স, দুই বাক্স গান-কটন। কোনোভাবে একটা গুলি এসে যদি তাদের নৌকায় লাগে তাহলে এমন বিস্ফোরণ হবে যে তারা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু কোনো সুরাহা হলো না। নৌকার টের পেলেই ক্যাম্প থেকে গুলি ছোঁড়ে। তারা আমাদের কাছে খবর পাঠাল। আমাদের সাহায্য চাইল।

আমরা ভেবে দেখলাম, ক্যাম্প থেকে যাতে গুলি না ছোঁড়ে এজন্য তাদের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? কে যাবে ওখানে? যাওয়াটা বিপদের। আলি আহমেদকে নিয়ে আমি বেলাবো বাজারে যাই। ক্যাম্পে ঢোকার সাথে সাথেই অপরিচিত দেখে তারা আমাদের অ্যারেস্ট করে ফেলে। আমরা জানালাম যে আমরাও মুক্তিযোদ্ধা। বিশ্বাস করল না। দু'হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমাদের গুলি করে মেরে ফেলবে। বোঝাতে চেষ্টা করলাম, তা কোনোভাবেই বোঝে না। পরিচয় জানতে চায়। কিন্তু পরিচয় দেয়া যাবে না। বললাম–

– কেন, আমাদের গা থেকে মুক্তিযোদ্ধার গন্ধ পাও না গর্দভ? মুক্তিযোদ্ধা কি গায়ে লেখা থাকে? আমরা এসেছি খালি হাতপায়ে, কোনো অস্ত্র নেই আমাদের সাথে। মুক্তিযোদ্ধা না হলে খালি হাতে আসার সাহস করতাম?

– তোমরা যে মুক্তিযোদ্ধা, তোমাদের কাছে তার কোনো প্রমাণ আছে?

– এই, তুমি তুমি করে বলো কেন? আপনি করে বলো? প্রমাণ কী? যুদ্ধের স্বার্থেই তোমাদের কাছে এর বেশি কিছু বলা যাবে না। জরুরি পরামর্শ আছে। তোমাদের কমান্ডারকে ডাকো। শুধু শুধু বিপদ ডেকে এনো না।

গরিমসী করছে দেখে বললাম– আমাদের মেরে ফেললে তোমাদের লাভ কী? আমাদের মেরে ফেললে তোমরা একটাও বাঁচবা না। ক্যাম্পের সবকটাকে মেরে ফেলবে। আমরা অনেক পাওয়ারফুল অফিসার। উপরের নির্দেশে এসেছি। তোমাদের কমান্ডারকে ডাকো।

কমান্ডারকে ডাকল। তাকে বুঝালাম বিষয়টা। বললাম–

– বাঙ্কার খুঁড়ে এখানে ক্যাম্প করে কোনো লাভ নেই। তোমরা দু'শো মুক্তিযোদ্ধা আছো। সব মারা পড়বে। ওই যে সাইলো দেখা যায়। এখান থেকে খুব কাছেই। তিন চারশো রাজাকার আর মিলিটারি এই ব্রিজ দিয়ে এসে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে। তোমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। ব্রিজটি উড়িয়ে দিতে হবে। রাতের অন্ধকারে আমরা নৌকায় করে আসব। টর্চ লাইট দিয়ে সঙ্কেত দেব। তোমরাও সঙ্কেত দেবে। খবরদার, গুলি ছুঁড়বে না। কাজ চুকিয়ে আমরা চলে যাব।

অনেক বুঝানোর পর রাজি করানো গেল। কিন্তু মুস্কিল একটা আছে। ব্রিজের গোড়াতেই রাজাকার ক্যাম্প। তারা টের পেলে কোনোভাবেই আর ব্রিজের কাছে ঘেঁষতে দেবে না। মেরে ফেলবে। সিদ্ধান্ত হলো ২০০ মুক্তিযোদ্ধা ল্যান্ড গেরিলা হেঁটে গিয়ে তাদের উচ্ছেদ করবে। সহজে কথা না শুনলে ক্যাম্প রেইড করবে। সে ক্ষেত্রে গুলি করে ব্রিজের দিক থেকে তাদের সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে অন্য দিকে। ল্যান্ড গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারদের ব্যস্ড় রাখবে। আর এদিকে এই সুযোগে উত্তর পাশের দুই পিলারে বিস্ফোরক বেঁধে দিয়ে চলে আসতে হবে। কাজটা খুব সহজ নয়। দ্রুত সেরে ফেলতে হবে। কারণ গোলাগুলির শব্দে সাইলো থেকে মিলিটারি চলে আসতে পারে।

কথামতো অপারেশন শুরু হলো। রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করা হলো। আর এই সুযোগে চ্যাপ্টা লোহার পাত দিয়ে দু'পাশ থেকে বিস্ফোরক বেঁধে দু'টো পিলারে ডেটোনেটর সেট করে সেফটি ফিউজ লাগিয়ে সবাই দ্রুত সরে পড়ে। আলি আহমেদ এবং আমি, আমরা দু'জন থাকলাম। আগুন ধরিয়ে দিয়ে দ্রুত সরে পড়তে

হবে আমাদের। মাত্র দেড় মিনিট সময় লাগবে। এরপর বিস্ফোরণ ঘটবে। এর মধ্যেই সরে পড়তে হবে বিপদমুক্ত স্থানে। আলি আহমেদ ম্যাচ জ্বালে। আমি সেফটি ফিউজে আগুন লাগিয়ে দ্রুত দৌড়ে সরে আসি নিরাপদ দূরত্বে। বড় একটা শিরীষ গাছের পেছনে বসে পড়ি। কানে আঙুল চেপে ধরি। ওদিকে গোলাগুলি চলতে থাকে। এরই মধ্যে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। কানে তালা লাগে। গোটা এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ব্রিজটি ভেঙে পড়ে। রাজাকাররা ভয়ে পালিয়ে যায়। কেউ কেউ গুলিবিদ্ধ হয়। কী অবস্থা হলো তা দেখার জন্য ব্রিজের দিকে ছুটছি। আলি আহমেদ কিছুতেই যেতে দেবে না। তার ধারণা দু'একটা রাজাকার লুকিয়েও থাকতে পারে। তারা আমাকে মেরে ফেলবে। আমি তার নিষেধ না শোনায় সে স্টেনগান উঁচিয়ে বলে– 'বিধান, ফের্, নইলে গুলি করে দেব'। এমনিতে সে বিধানদা বলে ডাকে। আজ বিধান বলছে। আমি তার সেন্টিমেন্টের মূল্য বুঝি। কিন্তু আমাকেতো নিশ্চিত হতে হবে যে ব্রিজটা সত্যি ধ্বংস হয়েছে। নইলেতো অপারেশন ব্যর্থ। তাকে বললাম, পাগলামি করো না, আমি দেখে আসছি। কিচ্ছু হবে না আমার। এখানে আর কোনো রাজাকার নেই আমি নিশ্চিত। এরপর দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়ি সবাই।

এলাকার লোকজন খুব খুশি। আওয়ামী লীগের নেতা হাশেম সাহেবের বাড়ি খাসি কেটে পরদিন দুপুরে খাবার আয়োজন। ওখানে দু'জন রাজাকারও ছিল। ধরে আনা হয়েছে। একজন বয়স্ক। হাবিবুল্লাহ। বয়স চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশ বছর। অন্যজন করিম। বয়স সতের/আঠারো বছর। গেরিলা কমান্ডার ইউসুপ পাকিস্তানি আর্মিতে চাকরি করত। এখন মুক্তিযোদ্ধা। পাক্কা ছয় ফিট লম্বা। ফর্সা। কোঁকড়ানো চুল। ইয়া বড় এক জোড়া কালো গোঁফ। হাতে মার্ক ফোর এর ধা চকচকে একটা বেয়োনেট। প্রায় এক ফিট লম্বা। দেখতে খুবই সুন্দর ওটা। বেয়োনেটটা দিয়ে নিজের কপালে একটা টান মেরে ওদের বলল– পেট ভরে খেয়ে নে জীবনের শেষ খাওয়া। বিকেলেই তোদের জীবনাবসান। আরও বেশি করে মাংস দে ওদের। জন্মের মতো খেয়ে নিক।

কে একজন এসে আরও বেশি করে মাংস দিয়ে গেল ওদের পাতে। যেন সারা জীবনের খাওয়া এখনই খেয়ে নেবে। তারা নিরুত্তর। ভাবাবেগহীন। মাথা নিচু করে খেয়ে যায়। পুতুল নাচের পুতুলের মতো হাত থালা থেকে মুখে ওঠে, আবার মুখ থেকে থালায় নামে। চোখ থালার দিকেই নিবদ্ধ। গলা দিয়ে তাদের ভাতের দলা নামছে কি নামছে না, কে জানে। অন্যের কথা শুনছে কি শুনছে না, তাও বোঝা যায় না। কলের পুতুলের মতো দু'জনেরই শুধু ডান হাত ওঠানামা করছে। আমি গিয়ে ধমক দিয়ে বললাম– এই, কী হচ্ছে, আপনি করছেন কী? ভয় দেখাচ্ছেন কেন? খাবার সময় এ সব বলছেন কেন? ওদের আরাম করে খেতে দিন। তোমরা পেট পুরে খাওতো। আরাম করে খাও।

খাওয়া শেষে বিচার শুরু। বহু লোক হাজির। নানা জনে নানা অভিযোগ বয়ান করে তাদের বিরুদ্ধে। তারা নির্বাক। কোনো প্রতিবাদ করে না। প্রতিরোধ করে না। অভিযোগ খণ্ডন করে না। পাথরের মতো বসে থাকে। যেন পাথরের বিচারসভা। কারো কারো ক্ষোভ আগুনের গোলার মতো ছুঁড়ে দেয় তাদের দিকে। তারা নিশ্চুপ। সিদ্ধান্ত হয় ওদের দু'জনকে মেরে ফেলা হবে। আমি বাঁচাতে চেষ্টা করি। বোঝাতে চেষ্টা করি তারা রাজাকার, ভুল করেছে, মানছি; কিন্তু ওদের মেরে ফেলা ঠিক হবে না। শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেও। নজর রাখো ওদের উপর। ইন্ডিয়ান আর্মি রাজাকারদের খুন করা পছন্দ করে না। কিন্তু পারলাম না। এক বয়স্ক লোক এসে বলল– 'অসম্ভব। আমার বউটাকে এরা দিনের পর দিন ধর্ষণ করেছে। ছিঁড়ে খেয়েছে। এই ছোকরাটাও কয়েকদিন গেছে। এদের বস্‌কেও নিয়ে গেছে। এদের কোনোভাবেই বাঁচিয়ে রাখা যাবে না'। লোকটার দিকে তাকিয়ে তার চোখে প্রতিহিংসা, ঘৃণা আর ক্রোধ দেখতে পেলাম। দেখলাম, চোখে তার প্রতিশোধের ভয়ঙ্কর আগুন। এরপর আর আমি কথা বলি নি।

বিকেলে মাঠে নিয়ে যাওয়া হলো দু'জনকে। খালি গা। চারদিক লোকে লোকারণ্য। কয়েক হাজার বছর আগের কোনো পুরনো বিচারসভা যেন। উৎসুক লোকেরা অপেক্ষা করে আছে শিরশ্ছেদের। বয়স্ক লোকটাকে বলা হলো শুয়ে পড়তে। সে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতো শুয়ে পড়ল। কোনো ভাবান্তর হলো না তার মুখের। অন্যজন দুই হাঁটু ভাঁজ করে থুতনি ঠেকিয়ে বসে থাকল মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।

শমশের বলে একজন সটান শোয়া রাজাকারের বুকে বেয়োনেট ঢুকাতে চেষ্টা করল। পারল না। এলোপাথাড়ি আঘাত করতে লাগল। ঢুকল না। বুক দিয়ে রক্ত বেরুতে থাকল। পাকিস্ড়ানি আর্মির লোকটা এসে ঝট্ করে তার হাত থেকে বেয়োনেটটা ছিনিয়ে নিয়ে বুকের পাঁজর ভেদ করে ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর ঢুকিয়ে দিল। লোকটা একটুও চিৎকার করল না। কাঁদল না। একটু দাপাদাপিও করল না। নিথর হয়ে গেল। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে কত কম ব্যবধান!

এরপর অন্যজনকে বলল– 'শুয়ে পড়'। সেও সুবোধ বালকের মতো শুয়ে পড়ল মাটিতে। যেন শুয়ে পড়াটাই নিয়ম এখানে। আজ্ঞা পালন করা ছাড়া আর কোনো কর্তব্য নেই। সে জন্যই সে অপেক্ষা করছিল। কোনো বিকার নেই। রহিম তার পা দু'টো চেপে ধরেছিল। গেরিলাদের ফার্স্ট ইন কমান্ডার মি. ভুঁইয়ার ডান হাতের দু'টো আঙুল নেই। বেয়োনেটটা কেড়ে নিয়ে বাঁ হাত দিয়ে তার পিঞ্জর ভেদ করে ঢুকিয়ে দিল সাঁই করে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। তারও মৃত্যু ওভাবেই হলো। তবে সে কাঁদল। অসমাপ্ত দীর্ঘজীবন তার সামনে পড়ে, হয়ত সে কারণেই। কিংবা এইমাত্রই সে মৃত্যুর বিভীষিকা অবলোকন করেছে, তার প্রতিক্রিয়ায়। অথবা মৃত্যুভয়ে। বা অনুশোচনায়। সে কেঁদেছে। ডুকরে ডুকরে কেঁদেছে। বারবার সে তার মা'র কাছে যেতে চাইছিল দেখা করতে। কাতর অনুনয়-বিনয় করছিল। তবে জীবন ভিক্ষা চায় নি সে। অন্য কোনো কথাও বলে নি।

মনটা বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের অন্তরে আবেগের স্থান নেই। কর্তব্য টেনে নিয়ে যায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেই। রাতেই রওনা দিতে হবে সরার চরের উদ্দেশে। সেখানে রেল ব্রিজ ধ্বংস করতে হবে। প্যারা মিলিশিয়া বাহিনীর ক্যাম্প আছে সেখানে। তিন চারশো মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে। ক্যাম্পের পতন ঘটানো যাবে না। রাতে ট্রেন থাকে সেনাসহ। রেল ইঞ্জিনটা উড়িয়ে দেয়াই আমাদের কাজ। মিলিটারিরা যাতে করে আর ট্রেনে চলাচল করতে না পারে। রাতের অন্ধকারেই আমরা রওনা দিলাম সরার চরের উদ্দেশে। আর এ সময়েই সেই গগণবিদারী বিকট আওয়াজ। অন্ধকার খান খান হয়ে গেল কামানের গোলার শব্দে আর আগুনের হল্কায়।

মিনার

এই হালার পুতেরা– বাইরঅ, শিগ্‌গির বাইরঅ ঘর থিক্যা; হক্কলেই বাইরঅ। কুনো চুদির পুতই ঘরের ভিতর হান্দ্যায়ে থাকপি না। বাইরঅ। বাপের জন্ম হইলি জলদি বাইরঅ।

চোলাই মেশানো ভুসি খাওয়া আবালের মতো ফাল পাড়ে আদর্শ ইন্সটিটিউটের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল আলহাজ্ব আব্দুল কুদ্দুস শিকদার ফরিদপুরী। ফাল পাড়ে আর বুনো শুয়োরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। দৃশ্যটা ভীতিপ্রদ হলেও মজার আর লোমহর্ষকও বটে। বেশ অভিনব, বেশ চমকপ্রদ। মাথায় সাদা টুপি, গালভর্তি মেহেন্দি লাগানো দাড়ি, পচা সুপারির মতো সুরমা লাগানো গোল গোল চোখ, আর জর্দা মেশানো পান খাওয়া দাঁতের কিড়মিড়ি– বাচ্চা বাচ্চা পোলা-মাইয়া গুলান ভয়ে একেবারে কেঁচো। কেঁচোগুলো কুঁকড়ে কুঁকড়ে যায়, আর লুকোনোর জন্য গর্ত খোঁজে। কোমলমতি এইসব শিশুরা দাদা-দাদির কাছে কেয়ামতের যে বর্ণনা শুনেছে তাতে তারা ভাবতে শুরু করে– রোজ কেয়ামত হয়ত শুরু হয়ে গেছে। আজ বুঝি রোজ কেয়ামতের দিন। আব্দুল কুদ্দুসের ফালের ঠেলায় তার পরনের একমাত্র লুঙ্গিটা আছে, না খুলে গেছে– তা বুঝতে পারে না এই কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা। তাদের সন্দেহ হলেও সন্দেহের নিরসন হয় না গায়ের পাঞ্জাবিটার জন্য। সেটা কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আসমুদ্রহিমাচলবিস্তৃত থাকায় অবশ্য লুঙ্গির গুরুত্বও তেমন আছে বলে মনে হয় না। কেয়ামতের আলামত পেয়ে শিশুশিশু ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই স্কুল ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে চারদিকে তাকায়। চারদিক একই রকম আছে। বুক ভরে শ্বাস নেয়। বাতাসের গন্ধ একই আছে– সেই ধুলো-ধোঁয়া মেশানো ম্যান্দামারা গন্ধ। ভয় পেয়ে একটা কুকুর আব্দুল কুদ্দুসের দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে তাকাতে দৌড়ে পালায়। শিশুরা আকাশে তাকায়। আকাশ আকাশের মতোই রয়েছে আকাশের জায়গায়। হাল্কা-পাৎলা কিছু কিছু মেঘ থাকলেও সেখানে কোনো কেয়ামতের আগুন কিংবা ইস্রাফিল কিংবা ইস্রাফিলের সিঙা কিংবা সেই সিঙার শব্দ– কিছুই দেখতে কিংবা শুনতে পায় না। দোজখের আগুন কিংবা কেয়ামতের আলামত কিছুই না দেখতে পেয়ে তারা হতাশ হয়।

আবার হুঙ্কার– এই হালিরা, তরা বাইরইছোস্ ক্যান? তগো বাইরইতে কইছি? কইছি হালার পুতেরা বাইরঅ। হালির পুতেরা বাইরঅ, কইছি? তাইলে খালি খালি বাইরইছোস্ ক্যান? মাইয়া পোলাপান যত্তো ছোডই অউক গিয়া– তা মাইয়া পোলাপানই। তরা জাহান্নামের রাস্তা। তরা খাড়াইয়া খাড়াইয়া মুতবার পারবি? ক, পারবি? তাইলে বাইরইছোস্ ক্যান? ঢোক, ভিতরে ঢোক। জলদি ঢোক। নইলে থাবা খাবি।

ভয়ে মেয়েগুলা নেকড়ের তাড়া খাওয়া ভেড়ার পালের মতো সুড়সুড় সুড়সুড় করে ঢুকে পড়ে একটা রুমের মধ্যে। সাড়ে তিন লাফে সোজা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আব্দুল কুদ্দুস মূর্তিমান আজরাইল। বাইরে থেকে ঝট্ করে লোহার শেকল টেনে আটকে দেয় দরজা। ফার্মের মুরগির মতো চুপ মেরে যায় মেয়েগুলান। গাদাগাদি-ঠাসাঠাসি-গাদাগাদি করে এক রুমের মধ্যে চুপসে থাকে সকল মেয়ে। কারো মুখে কোনো কথা সরে না ভয়ে। কোনো শব্দ হয় না। নিঃশ্বাস পতনের শব্দও না। ভয়ে বুকের রক্ত হিম। বরফের নীরবতা গলে চোখ বেয়ে ঝর্ণার জলধারার মতো নেমে আসে অশ্রু। তারপর আবার সাড়ে তিন লাফে নেমে আসে স্কুলের মাঠে। রণাঙ্গনে। যেখানে কোনো প্রতিপক্ষ নেই। রণ আছে, রণাঙ্গন আছে, প্রতিশোধ স্পৃহা আছে; প্রতিপক্ষ নেই। প্রতিপক্ষ শহিদমিনার। মৃত যোদ্ধার আত্মা।

'এল' প্যাটার্নের স্কুল ঘরের পুবদিকে কুয়াশায় রক্ত ছিটিয়ে সূর্য ওঠে। শহিদের রক্ত। সেই রক্তচ্ছটা এসে লাগে আব্দুল কুদ্দুসের মুখে, দাড়িতে, চোখে। চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করতে থাকে হায়েনার চোখের মতো। সে চেহারা ভয়ঙ্কর হিংস্র। পিশাচের মতো। দিনের বেলাতেও ভয় লাগে। তাকে দেখে যেন কিছুক্ষণ থমকে থাকে প্রকৃতি। সে যেন কারবালার এজিদ। প্রকৃতিও ভয় পায় তাকে। গাছের পাতা বিবর্ণ হয়, ফুলেরা শুকিয়ে যায়। সূর্যও চলে যায় মেঘের আড়ালে। প্রকৃতি থেকে বিদায় নেয় সমস্ত পেলবতা।

একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরি শেষে মাসদাইর ডিগ্রি কলেজের ভি. পি. জয়নাল সংসদের কিছু ছাত্রনেতা এবং বেশ কিছু ছাত্র নিয়ে ছুটে আসে স্থানীয় আদর্শ ইন্সটিটিউটে। এ স্কুলে কখনও একুশে ফেব্রুয়ারি– শহিদদিবস পালন করা হয় না। পালন করা হয় না স্বাধীনতাদিবস কিংবা বিজয়দিবস। পহেলা বৈশাখ কিংবা পহেলা ফাল্গুন। রবীন্দ্র-জয়ন্তী কিংবা নজরুল-জয়ন্তী। পালন করা হয় না বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান কিংবা সাংস্কৃতিক সপ্তাহ। এখানে কখনও জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় না, জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না। হয় মিলাদ মাহ্ফিল, বার্ষিক ওয়াজ। বড় জোর হামদ্ নাত ক্বেরাত প্রতিযোগিতা। এখানে কোনো বিধর্মী ছাত্র-ছাত্রী নেই। কোনো মহিলা শিক্ষক নেই। এ এক আজব স্কুল। বঙ্গোপসাগরের বিচ্ছিন্ন তালপট্টি দ্বীপের মতো বাংলাদেশে থেকেও যেন বাংলাদেশে নাই। সরকারি নিয়ম-নীতি বা রাজনৈতিক রক্তচক্ষু– কোনো কিছুর পরোয়া নেই। স্বশাসিত এ এক আজব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

ছাত্র-শিক্ষক লুঙ্গি বাধ্যতামূলক। নার্সারি থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত ছাত্র থাকলেও মেয়েরা এ্যালাউড নার্সারি থেকে ফাইভ পর্যন্ত। তা-ও বোরকা বাধ্যতামূলক মেয়েদের। মেয়েমানুষ হচ্ছে দোজখের দরজা। সেদিক থেকে আব্দুল কুদ্দুস মহা ভাগ্যবান। তার কোনো মেয়ে নাই। দুই স্ত্রী মিলিয়ে সন্তান সংখ্যা এগার। সবই ছেলে। এক একটা বংশের খুঁটি। প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে না জানিয়ে দ্বিতীয় কিস্তি বিয়ে করার ফলে ঝক্কিও কম সামলাতে হয় নি। প্রথম স্ত্রী খবরটা শুনে বেশ একটু তড়পা-তড়পি করেছিল। ধোপে টেকে নি। পানির মাছ ডাঙায় তুললে একটু তড়পায় কিছুক্ষণ, তারপর নিস্তেজ। শরিয়তি মারপ্যাচ তো কম জানা নেই। আব্দুল কুদ্দুস তার প্রথম বৌকে বলেছিল যে সে মাত্র দুইটা বিয়া করেছে, বেশি তড়পা-তড়পি করলে আরও দুইটা করবে। চারটা পর্যন্ত করার রাইট আছে। তাছাড়া গায়ে-গতরে যা তাতে চারটা স্ত্রী সামলানোর ক্ষমতা তার আছে। আল্লাহর অশেষ রহমতে টাকা পয়সারও কমতি নাই। চারটা বউ পোষার মতো সামর্থ্য তার আছে। সাপের লেজে পা পড়লে সাপ ফোঁস করে ঠিকই, আবার মাথায় পড়া-পানি পড়লে মাথা নুইয়ে ফেলে। প্রথম স্ত্রী ভয়ে কাদা-জল। এরপর দুই স্ত্রী পাল্লা দিয়ে ছেলে জন্ম দিয়ে চলেছে। আর আব্দুল কুদ্দুসও বুদ্ধি খাটিয়ে প্রতি বছর এক একজনকে এক এক ক্লাসে ভর্তি করিয়ে দিচ্ছে। নিজে আদর্শ ইন্সটিটিউটের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল বলে সব ক'টিই ফুল ফ্রি। সবচেয়ে বড়টি ক্লাস টেনে, আর সবচেয়ে ছোটটি নার্সারি। মাঝেরগুলা প্রত্যেক ক্লাসে এক একজন। পূর্ণ একটা ফুটবল টিম।

জোড়া বেত ছাড়া ক্লাসে যায় না আব্দুল কুদ্দুস। সে ক্লাসে ঢোকা মানেই রীতিমত বিভীষিকা। তার ছেলেরাও তাকে ভয় পায়। বাপকে দেখলে তারা বাপের নামই ভুলে যায়। প্রচণ্ড গরমেও ক্লাসে ঢুকেই ফ্যানগুলো বন্ধ করে দেবে। দু'পাশে দু'জনকে দাঁড় করাবে দু'টো পাখা হাতে। আস্তে কথা বলা তার অভ্যাস নয়। যখনই কথা বলে, চিৎকার করে বলে। মনে হয় ঝগড়া করে। হাঁক ছাড়ে– বাতাস কর। মৃদুমন্দ বাতাস চাই। জোরে বাতাস করলে বলবে– ঝড়ে উড়াইয়া দিবি নাকি? আস্তে করলে বলবে– আর এট্টু জোরে কর। ফ্যানের হাওয়া নয়, পাখার বাতাসই তার ভালো লাগে। তাছাড়া ফ্যানে শো শো শব্দ হয়। তাতে তার উপরের পাটির একটা ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ায় উচ্চারণের যে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়, তা অরও বেড়ে যায়। কেউ পড়া না পারলে নাকে ঘরঘর শব্দ তুলে কফ এনে থুক্ করে ছিটিয়ে দেয় তার মুখে। নয়ত মুখের থুতু ছিটিয়ে দেয় নাকে-মুখে। কখনও কখনও কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখে এক পায়ে খাড়া করে এক ঘণ্টা। তার প্রদত্ত অনেকগুলো শাস্তির মধ্যে অভিনব একটা শাস্তি হলো, মাঠে দাঁড় করিয়ে সূর্য-উপাসকের মতো সূর্যের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে রাখা। ছাত্রদের সাধারণত ভোদড়, উদবিড়াল, উদবিড়ালের ছা, খাটাশ– এ জাতীয় সম্বোধন ছাড়া অন্য কোনো সম্বোধনে ভূষিত করে না।

শহিদমিনারে ফুল দেয়া পূজার শামিল, হিন্দুয়ানি বলে স্কুলের কেউ কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে যায় না। স্কুলে সে প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, শহিদমিনারই নাই। সুখের বিষয় স্কুলে কোনো ফুল গাছও নাই। স্কুল হলো লেখাপড়ার জায়গা। গান-বাজনার জায়গা না। তা একদল কাফের গান-বাজনা শিখায়ে স্কুলগুলারে শিল্পকলা একাডেমি বানাইয়া ফেলছে। কোনো কোনো স্কুলে নাকি ড্যান্সও শিখায় শুনেছে। স্রেফ সিনেমা। হিন্দি সিনেমার ড্যান্স

অবশ্য লুকিয়ে চুরিয়ে মাঝে মধ্যে দেখে। মন্দ লাগে না। নাফাক, নাফাক। ওসব চলবে না এখানে। প্রিন্সিপ্যালের অনুপস্থিতিতে আজ আব্দুল কুদ্দুসই প্রিন্সিপ্যাল। তাই যে বনে খাটাশ রাজা, সে বনের মতোই অবস্থা এ স্কুলের। কচি কচি ছেলে-মেয়েগুলো যেন মুরগির বাচ্চা। খাটাশ তড়পাচ্ছে। ভি. পি. জয়নাল এ্যান্ড গং এর আগমনই এ তড়পানোর মৌলিক উপাদান।

জয়নাল একা আসে নি। সঙ্গী-সাথি নিয়েই এসেছে। 'একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর'। খালি হাতে আসে নি। এক বস্তা বালি, এক বস্তা সিমেন্ট; আর কয়েক বস্তা ইট নিয়ে হাজির। উদ্দেশ্য– নিজ হাতে একটা শহিদমিনার গড়ে দিয়ে যাবে। সিমেন্ট-বালি মিশিয়ে, ইটের ওপর ইট গেঁথে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তৈরি করে ফেলল একটা শহিদমিনার। দু'পাশের দু'টো ছোট, মাঝখানের একটা বড়– এই মোট তিন পিলারের শহিদমিনার। দেখলে মনে হবে– মাটি থেকে তিনটা আঙুলবিশিষ্ট একটা হাত বেরিয়ে এসে থেমে আছে। যেন আব্দুল কুদ্দুসকে থাবা দেবে। শাসাচ্ছে শহিদের হাত। দরোজা-জানালা বন্ধ অন্ধকার রুমের মধ্যে একা একা বসে আব্দুল কুদ্দুসের কেমন ভয় ভয়ই করতে লাগল। হঠাৎ কোথা থেকে এক আরশোলা উড়ে এসে আচমকা তার চ্যাপ্টা নাকের উপর পড়লে সে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। মৃত শহিদের আত্মা ভেবে ভয় পায়। আরশোলা তাড়িয়ে দিল। কিন্তু আঠালো কী একটা পদার্থ নাকে লেপ্টে থাকল। যথাযথ দূরত্ব ও সম্মান বজায় রেখে একটা ধাড়ি ইঁদুর সড়াৎ করে সরে পড়ল তার পায়ের কাছ দিয়ে। আঁৎকে উঠল। অল্পেই আঁৎকে ওঠে আজকাল। এসব আলামত ভালো ঠেকে না তার। অশুভ মনে হয়।

এই শহিদমিনারই আব্দুল কুদ্দুসের ক্রোধের উৎস। শালার কাফেরদের কাণ্ড। শহিদমিনার না বালের মিনার। রুমের মধ্যে বসে একা একা গজরায়। ছাত্রদের সামনে অবশ্য বের হবার সাহস পায় না পোঁদে লাথি খাওয়ার ভয়ে। যদিও তা লাথি মারার জন্য বেশ মানানসই। জয়নালকে সে বরাবর ভয় পায়। কোন্ সময় কী করে বসে, তার ঠিক নাই। পকেটে নাকি ওই জিনিসও থাকে সবসময়। বিশ্বাস কী, কোন্ সময় কপালে ঠেকায়ে দেবে। তারপর প্রথমে খট্টাস করে একটা শব্দ হবে। এরপর গুড়ুম। আব্দুল কুদ্দুসের কপাল চিচিং ফাঁক। ফুটো। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগবে ঘিলুতে। একবার এক থাপ্পরও খেয়েছিল সে। বাব্বা, কী রাম থাপ্পর! আড়াইশো কিলোমিটার বেগে এসে গালে পড়ল যেন সোয়া কেজি ওজনের বাটখারা। মনে পড়লে এখনও পিলে চমকে ওঠে। একাত্তর সালে মুক্তিরাও যা পরে নাই, ব্যাটা তাই করেছিল। গালভর্তি দাড়ি ছিল বলে রক্ষা। নয়ত চোয়ালটাই ভেঙে যেত মনে হয়।

শহিদমিনার গড়া হলে জয়নাল এবং তার সঙ্গীরা শহিদমিনারে ফুল দিয়ে গান ধরল– 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?' আব্দুল কুদ্দুস তখন তার রুমে কানে আঙুল দিয়ে বসে। যত্তোসব হিন্দুয়ানি কারবার! শালারা ছুঁচোর কেত্তন শুরু করছে। হারামির বাচ্চা অঙুলও বিশ্বাসঘাতকতা করে। যতই আঙুল চাপা দিক সুরটা কানের মধ্যে ঢুকে তীরের মতো খোঁচা মারে। নাউজবিল্লাহ্ ... নাউজবিল্লাহ্। কান থেকে আঙুল সরিয়ে দিয়ে একটু শোনে। মন্দ না। কাছে কেউ নেই। কানের আঙুল কিছুটা শিথিল করে শুনে নেয় একটু। স্বগতোক্তির মতো কণ্ঠ মেলায় গানের সাথে। মনটা বিগলিত হয়। গানটা শুনতে থাকে। নাউজবিল্লাহ্ ... নাউজবিল্লাহ্– এ সে কী করছে? আলতো করে নিজেই নিজের দুই গালে দুইটা চড় কষিয়ে দেয়। তওবা করে।

ইট-সিমেন্ট-বালির বস্তাসহ জয়নালদের স্কুলে ঢুকতে দেখেই ঝড়ের পূর্বাভাস টের পেয়েছিল আব্দুল কুদ্দুস। দ্রুত চলে গেছে নিরাপদ দূরত্বে। বিপদ এড়িয়ে চলাই ভালো। দরজা জানালা ফ্যান বন্ধ করে বসেছিল একা একা। তবুও মনের কোণে ছোট্ট একটা লোভ বুদ্বুদের মতো জেগে উঠে মিলিয়ে গিয়েছিল। দানা বাঁধতে পারে নি। ঝড়ের আকাশে মেঘের ফাঁকে একফালি রোদের হাসির মতো। তার একতলা বাড়ির এক পাশের বারান্দা এখনও ইন্‌কমপ্লিট। ঐ সিমেন্ট-বালির বস্তা হলে, আর ইটগুলা পেলে কাজটা শেষ করে ফেলা যেত। সব আশা কি পূর্ণ হয় মানুষের? তারও কত আশার মতো এ আশাটাও পূর্ণ হলো না।

মনে বড় আশা ছিল চারটা বিয়া করবে। মাত্র দুটো হলো। তা করতেই হিমশিম। কত ছলা-কলার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এবার তো আবার দুই বউ। দুই বউ দুই মেরুতে বাস করে। কেউ কারো ছায়া মারায় না। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে একজনের সাথে একটু বেশি খাতির জমিয়ে অন্যের দুর্নাম করে। অন্যের বিরুদ্ধে লাগাতে চেষ্টা করে। লাগেও টক্কর। কিন্তু রাজনৈতিক প্রশ্নে তারা এক মেরুতে। যখনই সংলাপের ইস্যু হয়, তখনই তারা এক হয়ে যায়। বিরুদ্ধ আচরণ করে। তৃতীয় বিয়ের কথা উঠলেই তেলে-জলে এক। দুই বউ মিলে মহাজোট গঠন করে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা কঠিন। তবু আশা ছাড়ে নি। কথায় বলে– যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। টার্গেট চার বিয়ে। এবার আর মাঝ বয়েসি না। কাঁচা বয়সের। একা থাকলেই মনে মনে পাত্রী সন্ধান করে।

শহিদমিনার গড়া হলো, কাজ শেষ হলো– এ ধারণা নিয়েই জয়নালরা প্রস্থান করল। মনে করল তাদের দায়িত্ব শেষ। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের মতো মিছিল করে শ্লোগান দিতে দিতে জয়নাল ও তার দলবল বেরিয়ে চলে গেল। এতক্ষণ তার রুমের দরজা বন্ধ করে তড়পাচ্ছিল আব্দুল কুদ্দুস। আর মাঝে মাঝে টিনের বেড়ার ফুটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল বাইরের কীর্তি। আর গজগজ করছিল রাগে। ভয়ে বেরুচ্ছিল না। ছাত্ররা চলে গেলে, বিপদের আশঙ্কা কেটে গেলে স্বমূর্তিতে বাইরে চলে আসে আব্দুল কুদ্দুস। এসেই লম্ফ-ঝম্প শুরু করে। যেন হনুমানের লেজে আগুন দিয়েছে কেউ। মেয়েগুলাকে ভেতরে ঢুকিয়ে সব ছেলেদের বের করে আনে রুম থেকে। আর শুরু করে হুঙ্কার।

ছেলেদের বড় থেকে ক্রমশ ছোটর দিকে লাইনে দাঁড় করিয়ে দেয় শহিদমিনারের সামনে। স্কুলের ছোট্ট উঠোনে লাইনটা সাপের মতো একেবেঁকে যায়। সাপের লেজের দিকটা যেমন সরু, লাইনটারও শেষের দিকটা সরু। দূর থেকে দেখলে খোসাখোলা পাইথনের মতো লাগে লাইনটা। আব্দুল কুদ্দুস সামনে এসে লাইনের একেবারে সামনে দাঁড়ানো সবচেয়ে বড় ছেলেটার কাছে এসে হুঙ্কার ছাড়ে– 'এই মাগীর পুত, খোল'। ছেলেটা হকচকিয়ে যায়। বুঝতে পারে না কী খুলতে বলছে কুদ্দুস স্যার। বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। আবার হুঙ্কার– 'জলদি খোল'। ছেলেটা বুঝতে না পেরে বলে– 'স্যার, কী খুলব?' ছাত্রের এ অগাধ মূর্খতায় বিস্মিত হয় আব্দুল কুদ্দুস। বাংলা কথা বোঝে না! এতদিন কী শিখিয়েছে সে? কী শিখিয়েছে এই আদর্শ ইন্সটিটিউট? বৃথা চেষ্টা। পণ্ডশ্রম। বলে– 'চেন। বুঝিস না, প্যান্টের চেন'। ছেলেটা বুঝতে পারে না হঠাৎ প্যান্টের চেন খুলতে বলছেন কেন স্যার। তাছাড়া এই বয়সে, প্রখর প্রকাশ্য দিবালোকে, স্কুলে, এতগুলা ছাত্র-ছাত্রীর সামনে প্যান্টের চেন খোলার তাৎপর্য কী? এটা কি একাত্তর সাল নাকি? তার সামনে কি পাকিস্তানি আর্মি? সে ইতস্ত ত করছিল দেখে আবার হুঙ্কার। ছেলেটির মনে হচ্ছিল সে চিড়িয়াখানার ভেতর, সিংহের খাঁচার সামনে। সিংহটা গর্জন করছে। এবারে লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ত্যাগ করে ঝট করে সে তার প্যান্টের চেন খুলে ফেলে। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে হুঙ্কার ওঠে–

– 'কর, পেচ্ছাব কর। বালের মিনার ভইর‍্যা পেচ্ছাব কর। পেচ্ছাবের পানিতে ভাসাইয়া দে। এক এক কইরা সব্বাই পেচ্ছাব করবি। কর।'

ছেলেটার কান ঝাঁঝাঁ করতে থাকে। মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। সে তার বাবার নাম মনে করতে চেষ্টা করে। পারে না। কবরে শুয়ে থাকা পূর্বপুরুষের কথা স্মরণ করে। বুঝতে পারে না দোজখ, না স্বপ্ন। তেষ্টা পায়। গলা শুকিয়ে যায়। ভয় করতে থাকে। পেচ্ছাব আর হয় না। অনেক চেষ্টা করেও এক ফোঁটা পেচ্ছাবও বের হয় না। বমি আসে, পেচ্ছাব আসে না। ছেলেটা বলে ওঠে–

– স্যার, পেচ্ছাব আসে না। শরম করে।

– এই বেশরমের দল, শরম কীসের রে? শরম করে না পেচ্ছাব না করতে? এই হুজ্জত আলি, এই আক্কেল মিয়া খাড়াইয়া খাড়াইয়া কী করতাছেন? এইগুলান ধাড়ি পোলাপান, পেচ্ছাব করতে শরম পাচ্ছে। ছোড থেইক্যা বড়র দিকে লাইন করান। লাইন উল্টাইয়া ল্যাজের দিক সামনে দেন।

হুজ্জত আলি, আক্কেল মিয়া দুই অনুগত শিক্ষক দ্রুত দায়িত্ব পালনে তৎপর হয়ে ওঠে। যেন কোনো মহৎ কর্মে নিয়োজিত দুই স্বেচ্ছাসেবক তারা। পুরো লাইনটা মুহূর্তের মধ্যে ঘুরিয়ে দিল। অজগরের লেজের দিকটা শহিদমিনারের সামনে আসে, আর মুখের দিকটা স্কুল ঘরের দিকে ঘুরে যায়, যেন এক্ষুণি হাঁ করে স্কুল ঘরটা গিলে খাবে দুর্দান্ত পাইথন। এবার যেন শহিদমিনার তাড়া করছে সাপটাকে। সবচেয়ে ছোট ছেলেটি শহিদমিনারের মুখোমুখি সবার সামনে দাঁড়ায়। মুরগির খাঁচায় আবদ্ধ মেয়েগুলা টিনের বেড়ার ফুটা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে এ দৃশ্য দেখে আর ভাবে, এর পর তাদের পালা। ছেলেগুলাকে তখন রুমের মধ্যে ঢুকিয়ে তাদের লাইনে দাঁড় করাবে পেচ্ছাব করাতে। এসব ভেবে তাদের কারো কারো দাঁতে কপাটি লেগে যায়। সবচেয়ে ছোট ছেলেটির প্যান্ট আছে কিন্তু প্যান্টে চেন নাই। তাই তাকে প্যান্ট খুলে ফেলার আদেশ দেয়া হলো। সে প্যান্ট খুলে দাঁড়িয়ে থাকল। ল্যাংটা পুটো। কিন্তু পেচ্ছাব করল না। আক্কেল মিয়ার আক্কেল আছে সত্যি। বসের আদেশের তোয়াক্কা না করেই সে আদেশ দিল–

– দে, দে ব্যাটা, পেচ্ছাব করে দে।

– স্যার, পেচ্ছাব হচ্ছে না।

– পেচ্ছাব হচ্ছে না মানে? ইয়ার্কি নাকি? আমার আদেশ। স্যারের আদেশ অমান্য করিস?

– স্যার, পেচ্ছাব আসে না।

– ক্যান পেচ্ছাব আসে না? মামাবাড়ির আবদার পাইছো? স্যারের সাথে বেয়াদপি? আলবৎ আসবে। পেচ্ছাবের বাপে আসবে। কর পেচ্ছাব। আমার হুকুম।

– স্যার, একটু আগেই পেচ্ছাব করছি। এখন আর পেচ্ছাব নাই।

– ক্যান, ক্যান একটু আগে পেচ্ছাব করলি? পারমিশন নিছিলি পেচ্ছাব করার? কার পারমিশনে তুই পেচ্ছাব করলি?

– ভুল হইছে স্যার। মাফ কইর‍্যা দ্যান।

লাইন থেকে আউট। নেক্সট। আক্কেল মিয়াকে ফ্লোর দিয়ে কিছুক্ষণ দম নেয় আব্দুল কুদ্দুস। চাউলের কল বন্ধ করার পরও কিছুক্ষণ যেমন হাপুস হাপুস শব্দ করতে থাকে, আব্দুল কুদ্দুসও তেমনি হাঁপাতে থাকে। মেদ-ভুড়ির কারণে অকারণে অল্পেই হাঁপিয়ে ওঠে। দ্বিতীয় জনেরও পেচ্ছাব হয় না। হুঙ্কার–

– পেচ্ছাব কর শিগ্‌গির।

– স্যার, আগেই পেচ্ছাব হয়ে গেছে।

– মানে?

আক্কেল মিয়া অবাক হয়ে দেখে ছেলেটার প্যান্ট আগে থেকেই ভিজা। ভয়ে আগেই পেচ্ছাব করে দিয়েছে। অতএব নেক্সট। তৃতীয় জনেরও পেচ্ছাব হয় না। নেক্সট। তারও একই অবস্থা। এর পরের জন। তারও পেচ্ছাব হয় না। এক এক করে সবাইকে ডাকা হলো। কারো পেচ্ছাব হলো না। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে আব্দুল কুদ্দুসের মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। শালারা পেচ্ছাব করতেও শিখল না। সবাইর পেচ্ছাব শুকিয়ে মরুভূমি। হঠাৎ যেন কেমন নৈঃশব্দ নেমে এল এ প্রতিষ্ঠানে। মরা মেহগিনি গাছের ডালে বসা মুখর কাকটাও যেন কা কা ডাকা ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে মাঠের দিকে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। কোথাও কোনো শব্দ নেই। আব্দুল কুদ্দুসও চুপ কয়েক মুহূর্তের জন্য। কবরের নীরবতা। এক ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দ।

সেই নীরবতা ভেঙে হঠাৎ আব্দুল কুদ্দুস সামনে লাল কাপড় ওড়ানো ষাড়ের মতো লাফ দিয়ে ওঠে। ছুটে গিয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তুমুল বেগে লাথি মারে শহিদমিনারের মাঝখানের পিলারের গায়ে। আর অমনি সাথে সাথে ধপাস। আল্লারে আম্মারে আব্বারে গেলামরে বলে গগনবিদারী চিৎকার। বুনো শুয়োরের বুকে বল্লম মারলে যেমন চ্যাঁচায়, তেমনি চিৎকার। হুজ্জত আলি আর আক্কেল মিয়া দ্রুত অকুস্থলে গিয়ে আব্দুল কুদ্দুসকে

উদ্ধার করে। কিন্তু আব্দুল কুদ্দুস পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না। ব্যথায় কঁকায়। লুঙ্গি তুলে দেখে আঙুল ফুলে নয়, পা ফুলে কলাগাছ। গোদ রোগীর পায়ের মতো পাটা ঝুলে আছে। মিনার ভাঙে নি, ভেঙেছে আব্দুল কুদ্দুসের পা। দ্বারোয়ান দৌড়ায় রিক্সার খোঁজে। হাসপাতালে নেয়ার প্রস্তুতি চলে। যাবার সময় হুজ্জত আলি আর আক্কেল মিয়াকে তাকে ধরে দাঁড় করাতে বলে শহিদমিনারের সামনে। তারা বুঝতে পারে না আব্দুল কুদ্দুসের মতলব। তাই কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থেকে হুকুম তামিল করে।

হুজ্জত আলি আর আক্কেল মিয়া আব্দুল কুদ্দুসের দুই পাশে দুইজন দাঁড়িয়ে তাকে ধরে খাড়া করে দাঁড় করায়। তিন পিলার বিশিষ্ট শহিদমিনারের মুখোমুখি তিন জন দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ। যা কেউ ভাবতে পারে নি, আব্দুল কুদ্দুস হঠাৎ তাই করে বসল। সবার সামনে তার পরনের রুহিতপুরী প্লেকার্ড লুঙ্গিটা ঝট করে তুলে ফেলল উঁচু করে এবং হঠাৎ চড়চড় শব্দে শুরু করে দিল পেচ্ছাব করা। এ যেন বিনা মেঘে বৃষ্টিপাত। চক্ষের পলকে ঘটনাটা ঘটে যাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক এতটাই হতবাক হয়ে যায় যে সিদ্ধান্ত নিতে ভুলে যায় চোখে পলক ফেলবে কি ফেলবে না। আর বিচার বিশ্লেষণ করার আগেই সম্পন্ন হয়ে যায় শহিদমিনারের শিশ্নস্নান। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল–

– দ্যাখ, ক্যামনে পেচ্ছাব করতে হয়। যত সব কাফেরের দল, কিচ্ছু শেখে না। শেখ, ভালো করে পেচ্ছাব করা শেখ। আমার ঠ্যাং ভাঙছে। তোরা ঐ মিনার ভাঙবি। ভেঙে গুঁড়া গুঁড়া করে দিবি। তারপর ইটগুলা আমার বাড়িতে দিয়া আসবি। আমি তাই দিয়া পেচ্ছাবখানা বানাব। সারাজীবন ওই ইট ভইরা আমি সুখে পেচ্ছাব করব।

হুজ্জত আলি আর আক্কেল মিয়া আব্দুল কুদ্দুসের দুই পাশে দুইজন দাঁড়ানো। তাকে ধরে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে শহিদমিনারের দিকে তাকিয়ে দুই সাগরেদ। কিছুক্ষণ স্থির থাকে। তিনজন এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে যে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তাদেরকে তিন মিনারবিশিষ্ট একটা জ্যান্ত শহিদমিনার বলে মনে হয়। তারা যেন মৃত শহিদমিনারের প্রতিপক্ষ জীবন্ত শহিদমিনার।

লতিফ চাচা

– মাও, এখানে পানির কলডা কোথায়?

– পানির কল? পানির কল দিয়ে কী হবে?

– ভারি পিপাস লাগছে।

– কলের পানি খেতে পারবেন নাকি? তা কি ভালো? রাস্তার কল বলে কথা?

– সমস্যা নাই বাজান।

– আর এত রাতে এখানে এলেন কোত্থেকে আপনি?

– এই রাস্তায় নাইট-গার্ডের চাকরি করি।

– আগে তো দেখি নি কখনও? কতদিন হলো?

– মাসখানেক।

– বাড়ি কোথায়?

– নীলফামারি।

– আচ্ছা। আসুন আমাদের সাথে।

রাত বারোটা সাড়ে বারোটা নাগাদ ফিরছি পঁচিশে-বৈশাখ অনুষ্ঠান শেষে। পাড়াটা তখন ঘুমিয়ে। জনহীন। শান্ত। দু'একটা কুকুর ছাড়া তেমন কোনো প্রাণী চোখে পড়ে না। দু'এক বাড়িতে আলো জ্বলছে। সাদা চুল সাদা দাড়ি সত্তরোর্ধ্ব লোকটার সাথে দেখা গলির ভেতর। গায়ে পুরনো পাঞ্জাবি। পরনে লুঙ্গি। হাতে বোতল। পানি খুঁজছেন। ভরাট কণ্ঠে আমার স্ত্রীকে বললেন– মাও, এখানে পানির কলডা কোথায়?

গমগমে আভিজাত্যপূর্ণ কণ্ঠ। মেঘমন্দ্র আওয়াজ। মায়াবী। উচ্চারণে আঞ্চলিকতার প্রভাব থাকলেও বেশ শুদ্ধ। কথা বললে মনে হয় আবৃত্তি করছেন। কেমন মায়া হলো। বাসায় নিয়ে এলাম। ডাইনিং টেবিলে বসালাম। ফিল্টার থেকে এক গেলাশ জল ঢেলে দিল ঋতু। তারপরেই মনে হলো শুধু জল দেয়াটা ঠিক হলো না। 'একটু দাঁড়ান' বলে কৌটো থেকে বিস্কুট বের করে পিরিচে সাজিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল– রাতে খেয়েছেন?

– হ্যাঁ, খেয়েছি।

– কখন?

– সন্ধের টাইমে।

ঋতুর মনে হলো শুধু বিস্কুট দেয়াটা ঠিক হলো না। কোন্ সন্ধের সময় কী খেয়েছেন, এখন ক্ষিধে পাওয়াটাই স্বাভাবিক। তাড়াতাড়ি পাউরুটি সেঁকে ডিম ভেজে দিল। খাওয়ার ফাঁকে কথা হচ্ছিল। বাড়ি নীলফামারি। স্ত্রী আর দুই মেয়ে। বাড়িতে। বড় মেয়েটির বিয়ে হয়েছে। লেখাপড়া বিশেষ একটা হয়ে ওঠে নি। স্বামীর বাড়ি থাকে। ছোট মেয়েটি ক্লাস নাইনে পড়ে। বাঁশঝাড় ছাড়া আয়ের আর কোনো উৎস নেই। সংসার চালানোই দায়। তার উপর মেয়ের লেখাপড়া। এলাকার একজন এখানে নাইটগার্ডের চাকরি করে। সে-ই তাকে নিয়ে এসেছে এখানে। কথায় কথায় ঋতু জিজ্ঞেস করল– এখনতো আমের সময়, আপনাদের এলাকায়তো প্রচুর আম হয়; কোনো আম খেয়েছেন এবার?

– না, মাও।

– সে কী? আপনাদের অঞ্চলে এত আম হয়, তা এবার কোনো আম খান নি আপনি?

– এখানে আমের খুব দাম মাও। গরিব মানুষ।

আমের দেশের মানুষের আম জোটে না। কথটা বুকে লাগল। সুকান্ত'র 'প্রিয়তমাসু' কবিতার সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিটি মনে এল 'আমি যেন সেই বাতিওয়ালা/ যে সন্ধ্যায় রাজপথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে/ অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য/ নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার'। ঋতু উঠে ফ্রিজ থেকে দু'টো হিমসাগর আম বের করে কেটে দিল। লোকটার চোখে জল এসে গেল। আম মুখে দিতে দিতে চোখের জল সামলে নিলেন।

ঋতু জিজ্ঞেস করল– সন্ধের সময় কী খেয়েছেন?

– খেয়েছি মাও।

– কী খেয়েছেন?

– খেয়েছি।

যেন বলতে চাচ্ছিলেন না। লুকোচ্ছিলেন।

– কী খেয়েছেন তা বলছেন না কেন?

– রুটি আর তরকারি।

– ভাত খান নি রাতে?

– না মাও। রাতে রুটি তরকারি খাই। ভাতে খরচ বেশি পড়ে।

কথাটা এক দলা অসহায়ত্ব ছড়িয়ে দিল। ঋতুর কষ্ট হলো। আমারও।

– ভাত খান? মাছ আছে, মাংস রান্না করা আছে। গরম করে দেই?

ঋতুর দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করে রইলেন। ঋতু রান্নাঘরে ঢুকে গেল। দশ মিনিটে খাবার টেবিলে প্রস্তুত। তৃপ্তি সহকারে খেলেন। খাওয়ার সময় খুব একটা কথা বলেন নি তিনি। চোখে যেন থমথম করছিল মেঘ। দেখে মনে হচ্ছিল এমন ভালো করে অনেকদিন খান নি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম– থাকেন কোথায়?

– শিবু মার্কেট।

– ওখানে কেন?

– ভাড়া কম।

– কত?

– দুইশো টাকা।

– খান কোথায়?

– ওখানেই। খেতে লাগে বারোশো টাকা।

– বেতন পান কত?

– দুই হাজার।

– তাহলে বাড়ি পাঠান কী?

– ছয়শো টাকা।

– হাত খরচ? তারপর আসা-যাওয়া?

– শিবু মার্কেট থেকে বাসে আসতে এক টাকা, যেতে এক টাকা। আমি হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি, আবার হাঁটতে হাঁটতেই চলে যাই। মাসে বাসভাড়া ষাট টাকা বাঁচে। তাছাড়া এটুকুমাত্র পথ। মাত্র দুই কিলোমিটার।

এ আর এমন কী? আর কোনো খরচ নাই আমার। পান-বিড়ি-সিগারেটের নেশা নাই। বুড়া মানুষ। তেমন কোনো শখ আহ্লাদ নাই। কোনোরকমে চলে যায় বাজান।

এরপর হাতের বোতলে ফিল্টার থেকে এক বোতল জল ভরে দিয়ে ঋতু বলল– চাচা, আপনার যখন ইচ্ছে হবে আমার বাসায় চলে আসবেন। যা খেতে ইচ্ছে হবে, বলবেন। লজ্জা করবেন না। আর প্রতিদিন এই ফিল্টার থেকে এক বোতল করে জল নিয়ে যাবেন। মনে করবেন আমিই আপনার মেয়ে। আপনার মেয়ে কাছে থাকলে সে তো এটুকু করত, তাই না? লতিফ চাচার চোখে চিকচিক জল। এরপর উঠলেন। বাজান আসি, মাও আসি বলে চলে গেলেন। কেমন আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলাম মুহূর্তেই। তিনি চলে গেলেন। কিন্তু রয়ে গেল তাঁর ভরাট কণ্ঠের আওয়াজ। মায়াবী সম্বোধন– মাও, এখানে পানির কলডা কোথায়? সারা ঘরে শব্দটা যেন আঠার মতো লেগে রইল– মাও, এখানে পানির কলডা কোথায়? তিনি চলে গেলেন, কিন্তু মন জুড়ে রেখে গেলেন কী এক সম্মোহন। বুকের ভেতর কী এক কষ্ট এবং ভালো লাগা বোধ মিলেমিশে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকল একত্রে। মিশ্র একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল গোটা দেহ ও মনে। তাঁর সম্বোধনটা প্রতি মুহূর্তে প্রতিধ্বনি তুলে বেজে যাচ্ছিল বুকে। যেন কত যুগের আপন।

এরপর প্রতি রাতে একবার করে আসা চাই-ই তাঁর। না এলে কী যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায় দিনটায়। লতিফ চাচারও হয়ত ঋতুকে দেখার ছল করে মেয়েকে দেখে যাওয়া হয় একবার। মেয়ের হাতের এক কাপ চা খাওয়া হয়। অনেক গল্প হয় তাঁর সাথে। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। ভারতে ট্রেনিং নিয়েছেন। দেশ স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ করেছেন। এখন না খেয়ে মরতে হয়। লেখাপড়া তেমন হয় নি তাঁর। হাইস্কুল পর্যন্ত পড়েছিলেন। যুদ্ধের ডাক এলে যুদ্ধে যান। দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশে ফিরেছেন। এরপর সংসারের জোয়াল কাঁধে। বিয়ে। সন্তান। মেয়েকে লেখাপড়া করাতে পারেন না। বেতন দিতে পারেন না। বই কিনে দিতে পারেন না। ভালো জামা দিতে পারেন না। স্ত্রীকে শাড়ি কিনে দিতে পারেন না। সংসারে নিত্য অভাব। স্বাধীন দেশের মুক্তিযোদ্ধা আজকের নাইট-গার্ড। এখনও তিনি যুদ্ধ করেন বাঁচার জন্যে। এখনও পাহারা দিয়ে যান দুর্বৃত্তদের।

রোজ রাতেই প্রায় আসেন তিনি। এ কথা সে কথা হয়। যুদ্ধের কথা, জীবনের কথা, মানুষের কথা। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অভাব আর সংগ্রামের কথা। কিন্তু মাস তিনেক পেরিয়ে গেলে এক রাতে বললেন– মালিক বেতন দেয় না। দেই-দিচ্ছি করছে। বেতন চাইলে ধমক দেয়। গালি-গালাজ করে। বাড়িতে টাকা পাঠানো দরকার। এখানে হোটেলে বাকি পড়েছে। মেয়ের স্কুলের বেতন দিতে পারছেন না। বই কিনতে পারছেন না। বৃদ্ধের চোখে সমস্যা ও সঙ্কট প্রকট। লজ্জায় এতদিন জানান নি। হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললাম– এটা আপাতত বাড়ি পাঠিয়ে দিন। আর আগামীকাল মেয়ের বই যোগাড় করে দেব। পরে পাঠিয়ে দেবেন। চিন্তা করবেন না। দেখি কী করা যায়।

মেয়ের জন্যে জামা-কাপড় আর কিছু বই পাঠিয়ে দিলাম। কিছুটা হলেও স্বস্তি। এভাবেই চলছিল। আরও মাসখানেক বাদে এক সন্ধ্যায় এসে কেঁদে ফেললেন– মাও, আমার চাকরিটা চলে গেছে। দুই মাসের বেতন বাকি। মালিক বলে– বুড়া মানুষ, বসে বসে ঝিমাও। ঠিকমতো পাহারা দিতে পারো না। তোমারে দিয়া চলবে না। আসলে কী জানো মাও, মালিকের ভাইস্তা পাশের বাড়ির গ্রিল ভেঙে টিভি চুরি করেছে। আমি দেখে ফেলেছিলাম। তারা আমাকে শাসালো– কাউকে বললে গলা টিপে মেরে ফেলবে। আমি এখন কোথায় যাব, কী করব মাও? তাঁর চোখের জল কষ্টের উদ্রেক করে। তিনি যেন আমাদের পরিবারেরই একজন। তাছাড়া একজন মুক্তিযোদ্ধা। তাই আঘাতটা আমাদেরও লাগল। কিছু একটা করা দরকার।

সান্ত্বনা দিয়ে রাতের খাবার খেতে দেয়া হলো। পরদিন আসতে বলে মেসে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু ভেবে কোনো কূল পাচ্ছিলাম না কী করা যায় লোকটার জন্যে। হঠাৎ মাথায় এল আমলাপাড়া হাইস্কুলে দারোয়ান বা নাইট-গার্ড বা ওই জাতীয় কোনো কাজে তাকে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে কিনা। হেডমাস্টার এবং স্কুল পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান আমাদের বিশেষ পরিচিত। রাতেই যোগাযোগ করলে তাঁরা আশ্বাস দিলেন।

পরদিন লতিফ চাচা এলে হাতে কিছু টাকা দিয়ে স্টুডিওতে পাঠিয়ে দেয়া হলো রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি তুলতে। আর্জেন্ট ছবি তুলে নিয়ে এলেন। নিজ হাতে দরখাস্ত কম্পোজ করে প্রিন্ট দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম স্কুলে। চাকরিটা হয়ে গেল। নাইট-গার্ড। মাসিক বেতন আপাতত তিন হাজার টাকা। মুখে এক গাল হাসি নিয়ে সন্ধের সময় এসে হাজির। একজন মুক্তিযোদ্ধার মুখে বিজয়ের হাসি দেখে প্রাণটা ভরে গেল।

ভালোই চলছিল। বেতন ছাড়াও নানা কাজ থেকে অতিরিক্ত কিছু আয় হয়। স্কুলের নাইটগার্ডের তেমন কোনো কাজও নেই। মেইন গেট আটকানো হয়ে গেলে ঘুমিয়ে পড়লেও অসুবিধা নেই। চাকরিটা তাঁর যোগ্য। মেয়ের স্কুলের বেতন, বই, পোশাক, স্ত্রীর শাড়ি, হাতখরচ– নিয়মিত পাঠাতে পারেন। শরীর ও মনে শান্তির ছাপ। স্কুলেই একটা রুমে থাকার জায়গা হয়েছে। রাতে অবশ্য বারান্দায় শুয়ে বসেই কাটান। খান পাশেই এক হোটেলে মাসিক চুক্তিতে। আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার যেন শেষ নেই তাঁর। প্রতিদিন একবার বাসায় না এলে চলে না। দিন মাস বছর কেটে যায়। লতিফ চাচা আমাদের আপনজন হয়ে ওঠেন। সংসারেরই একজন সদস্য হয়ে ওঠেন। ভালো কোনো খাবার হলে তাকে ছাড়া যেন চলে না আমাদের। জন্মদিনে আমার মেয়ের জন্য কিনে নিয়ে এলেন লাল একটা ফ্রক। ছোট্ট আমার মেয়েটার খুশি দেখে কে? অন্য অনেক গিফ্‌টের চেয়ে ওটাই যেন তার কাছে বেশি প্রিয়। কারণ, ইতোমধ্যে লতিফ চাচার সঙ্গে তার মিষ্টি সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে।

বছর দুই/তিন হয়ে গেল। বেতনও তিন হাজার থেকে বেড়ে পাঁচ/ছয় হাজার টাকা। সবার প্রিয় লতিফ চাচা। সবার সাথে তাঁর সুসম্পর্ক। নাইট গার্ড হলেও সবাই তাঁকে সমীহ করে। একজন মুক্তিযোদ্ধা বলে তাঁকে সম্মান করে। ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়দিবসের অনুষ্ঠানে স্কুলের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাঁকে সম্মাননাও দেয়া হয়। উত্তরীয় পরানো হলো। ক্রেস্ট দেয়া হলো। কিছু টাকাও দেয়া হলো। স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় সে খবর ছাপাও হলো। এত সুখ তাঁর সত্তর বছরের জীবনকে কানায় কানায় ভরে দিল। কিন্তু এরই মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাত। কথা নেই বার্তা নেই লতিফ চাচা আসেন না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল চাকরিটা চলে গেছে। লজ্জায় কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেছেন নিরুদ্দেশে। হয়ত দেশের বাড়ি। তাঁর বিরুদ্ধে ল্যাবরেটরির মাইক্রোসকোপ চুরির অভিযোগ আনা হয়েছে। কথাটা বিশ্বাস করতে পারি নি। অসম্ভব। লতিফ চাচার পক্ষে এ কাজ করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। তাঁকে কয়েক বছর ধরে দেখে আসছি। তাছাড়া তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি এ কাজ করতে পারেন না। কিন্তু লতিফ চাচার সাথে যোগাযোগের কোনো উপায় নেই। তাঁর কোনো মোবাইল ফোন ছিল না। তাঁর বাড়ির ঠিকানাও জানা নেই। চুরির দায় মাথায় নিয়ে লতিফ চাচা চলে গেছেন হয়ত গ্রামের বাড়ি। নীলফামারি। দুঃখে কষ্টে অসম্ভব অভিমানে কাউকে কিছু না জানিয়ে লতিফ চাচা চলে গেছেন মেকি শহর ছেড়ে। আর দেখা হয় নি তাঁর সাথে। কোনো খোঁজও পাই নি আর। তবে একটিবারের জন্যেও আমি ভুল বুঝি নি তাঁকে। কখনওই মনে হয় নি লতিফ চাচা চোর। প্রথম দিনে শোনা লতিফ চাচার কণ্ঠস্বরটা বারবার কানে বাজতে থাকে– মাও, এখানে পানির কলডা কোথায়?

কয়েক মাস কেটে যাবার পর আমার ঠিকানায় একটা চিঠি এল। চিঠিটা লিখেছে তার ছোট মেয়ে সুনন্দা। সে এবার অনার্স ফাইনাল দেবে। সে জানে না তার বাবা চোর। কিংবা চুরির অপরাধে চাকরি হারিয়েছে। সে জানে তার বাবা মুক্তিযোদ্ধা। কয়েকদিন হলো তার বাবা মারা গেছে। রাষ্ট্রীয় সম্মানে তাকে দাফন করা হয়েছে। বৃদ্ধা মা শুধু কাঁদে। আমার কাছে কিছুই চায় নি সে। কোনো ঠিকানাও দেয় নি। শুধু খবরটা জানানোর জন্যে চিঠি। ঋতু কেঁদে চোখ ভাসায়। আমার বুকের ভেতর গুমরে থাকা মেঘের অস্তিত্ব টের পাই। এক দলা কষ্ট জমে থাকে বুকে। লতিফ চাচা আমাদের শুধু আপনজনই নয়, একজন মুক্তিযোদ্ধা। সেই অহঙ্কারের জায়গাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। যদিও আমার বিশ্বাস হয় নি, হবেও না কোনোদিন যে লতিফ চাচা চোর। লতিফ চাচা নেই, কিন্তু প্রথম দিনে শোনা তাঁর কণ্ঠস্বরটা বারবার কানে বাজতে থাকে– মাও, এখানে পানির কলডা কোথায়?

মুক্তিযোদ্ধার গল্প এত তাড়াতাড়ি শেষ হয় না। পিরোজপুরের অমল সহকারী নাইট গার্ড। বয়স অল্প। লতিফ চাচার ছেলের বয়সি। সেই অধিকারে তাকে উপদেশ দিতেন। শাসন করতেন। নিজের ছেলে নেই। তাই অমলকে ছেলের মতো ভালোবাসতেন। কোথায় যেন সূক্ষ্ম বাৎসল্য প্রেম লুকিয়ে থাকত। স্কুলের গেট বন্ধ হবার পর চাবি থাকত অমলের কাছে। রাতের খাওয়া শেষে একটু পায়চারী করতেন, তারপর বারান্দায় মশারী টাঙিয়ে ঘুম দিতেন লতিফ চাচা। মাঝে মাঝে উঠে পুরো স্কুল চত্বরটা চক্কর দিয়ে আসতেন। রাত বাড়লে একদল বখাটে যুবক আসত আড্ডা দিতে। সাথে বোতল থাকত। মদ খেত। মেয়েমানুষও থাকত। বখশিসের বিনিময়ে অমল গেট খুলে দিত। লতিফ চাচা লক্ষ করেছেন ব্যাপারটা। কয়েকদিন অমলকে বকেওছেন। সে শোনে নি। ওদিকে বিকেলের শিফটের ইন চার্জ দিলরুবা ম্যাডাম স্কুল ছুটির পরও যান না। কাজের দোহাই দিয়ে বসে থাকেন। চারদিক অন্ধকার হয়ে এলে বি.এসসি. টিচার অশোকবাবু আসেন স্কুলে। প্রতিদিন কী জরুরি কাজ থাকে তার। দরজা বন্ধ করে দিলরুবা আপার রুমে আড্ডা দেন রাত আটটা/ ন'টা পর্যন্ত। লতিফ চাচার দৃষ্টি এড়ায় না এসব।

গোপন বিষয়গুলো আর গোপন থাকে না একসময়। এক কান দু'কান করে পাঁচ কান হয়ে যায়। স্বভাবতই দোষ লতিফ চাচার ঘাড়ে গড়ায়। অমল তো তুরুপের তাস। তাকে হাত করা টাকা দিয়ে। দিলরুবার দিলের দরজায় ধাক্কা লাগল। মদ্যপগুলোর স্বাভাবিক গতিতে বাধা পড়ল। ভিতরে ভিতরে তারা মহাজোট গঠন করল। লতিফ চাচা বৃদ্ধ, সন্ধে হলেই ঘুমায়, মিথ্যে কথা বলে– ইত্যাদি নানা অপবাদ দিয়ে হেডমাস্টার এবং চেয়ারম্যানের কান ভারি করা হলো। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে লতিফ চাচার কথা ধোপে টিকল না। তার উপর মাইক্রোসকোপ চুরির ঘটনা। ওটা লতিফ চাচারই কাজ। মেয়ের ফরম ফিলাপের টাকা যোগাড় করার জন্যেই এ কাণ্ড। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। মদ্যপগুলো তালা ভেঙে মাইক্রোসকোপ করল চুরি, আর দোষ চাপানো হলো লতিফ চাচার উপর। সাক্ষী শক্তিশালী, তাই চুরির অপবাদ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধার চাকরিচ্যুতি।

এ লজ্জা কোথায় রাখবেন? কাউকে কিছু না বলে তাই পরদিন সকালেই বাসে চেপে নীলফামারি। মনের কষ্ট মনে পুষে রাখলেন। এক প্রকার আত্মনির্বাসন। দুঃখে কষ্টে অপমানে স্বাধীন বাংলাদেশে আর বেশিদিন বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয় নি হয়ত লতিফ চাচার। তাই খুব বেশিদিন আর বাঁচেন নি। কিন্তু বাড়িতে তাঁর কেউ জানে নি এ ঘটনা। লতিফ চাচা কাউকে বলেন নি যে সে চোর।

আমি আর ঋতু ছাড়া আর কেউ জানে না লতিফ চাচার মৃত্যুর খবর। কী-ই বা হবে জেনে? একজন মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে কোথাও কোনো প্রভাব পড়ে না সমাজে কিংবা রাষ্ট্রে। তাঁর অবর্তমানে কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে যথারীতি চলছিল রাতের কীর্তি-কলাপ। প্রতিদিন সূর্য ওঠে সূর্য ডোবে, রাতের কীর্তি থেকে যায় রাতেরই অন্ধকারে। এক সকালে স্কুলের মাঠে এক যুবকের লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেল। ছড়িয়েছিটিয়ে বোতল ভাঙা গেলাশ প্যান্টি ব্রা ছেঁড়াস্যান্ডেল। অমল লাপাত্তা।

এনগেজমেন্ট

অবশেষে দশ সেপ্টেম্বর এনগেজমেন্ট হয়ে গেল। বিয়ে দশদিন পরে। ছেলে হিসেবে সাদেক সবারই পছন্দের। আপত্তি একটাই– সে তাবলিগ করে। বছরের বেশিরভাগ সময়ই কাটে এখানে সেখানে। আয়েশার মা আমেনা বেগম তাই গড়িমসি করছিল। কিন্তু বাবা আবু হোসেন এক পায়ে খাড়া। পছন্দের প্রথম কারণ– সাদেক তার বোনের ছেলে। দ্বিতীয় কারণ– একমাত্র সন্তান আয়েশার পছন্দ। ছেলেবেলা থেকে প্রায় একই সাথে মানুষ হয়েছে ভাইবোনের মতো। তারপর কবে কবে প্রণয়ের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে পরিণয়ের কাঠগড়ায়। আবু হোসেনের ভেতরে ভেতরে অন্য আরেক মতলব খেলা করছিল– সাদেকের সাথে বিয়ে হলে সাদেককে ঘরজামাই হিসেবে পাওয়া যাবে এবং তার সম্পত্তি নিজেদের ভেতরেই থাকবে। আর বিয়ে হলেই সাদেক ঘরমুখো হবে– এরকমই ছিল ধারণা।

ভেতরে আনন্দের বাতাস আয়েশাকে বেলুন করে দেয়। সে যেন প্রজাপতি, সারা ঘরে উড়ে উড়ে বেড়ায়। খুশি যেন তার শিরায় শিরায় নাচে। আয়নায় নিজের মুখ দেখে। নিজের ঘরে গিয়ে লুকিয়ে সাদেকের দাড়িওয়ালা পাগড়ি পরা একক ছবিখানা দেখে। পুলকিত হয়। বুকের শ্বাস ঘন হয়। আবার রেখে দেয় বালিশের নিচে কিংবা এ্যালবামের গোপন পাতায়। গুনগুন করে সুর ভাঁজে। টি.ভি. খোলে। টক শো দেখে। নাটক দেখে। ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দেখে। স্থির থাকতে পারে না। এ চ্যানেল ও চ্যানেল ঘুরে বেড়ায়। চ্যানেলে চ্যানেলে আনন্দ ভ্রমণ। বাবা-মা টের পায় একমাত্র সন্তানের এই খুশির আমেজ। তারাও খুশি সন্তানের খুশিতে।

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১। সন্ধে ৭টা। আয়েশা পি.টি.ভি. চ্যানেলে। হঠাৎ সে দেখতে পায়– নিউ ইয়র্কের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের একটিতে আগুন। তার ছোট চাচার কথা মনে পড়ল তৎক্ষণাৎ। সে তো ওখানেই কাজ করে! দুই বিল্ডিং এর মাঝে দাঁড়িয়ে তোলা তার ছোট চাচার একটা ছবি পাঠিয়েছিল গতবার। পেছনে লেখা ছিল– 'World Trade Centre'। বুঝতে পারল না আয়েশা, ওখানে কীভাবে আগুন লাগতে পারে। ছোট চাচার জন্য ভাবনা হলো। তখনও একুশে টি.ভি.র সংবাদের সময় হয় নি। চ্যানেল পাল্টে বি.বি.সি. তে এসে থামে। ইংরেজি সে ভালো বোঝে না। তবু বসে থাকে স্থির টি.ভি.র পর্দায় চেয়ে। দেখতে থাকে দাউদাউ জ্বলা আগুনের লেলিহান শিখা।

হঠাৎ তার চোখকে অবিশ্বাস্যরকম কাঁপিয়ে অন্য বিল্ডিংটায় ঢুকে যায় একটি বিমান। ভয়ে 'আম্মা' বলে চিৎকার দিয়ে ওঠে আয়েশা। কী সাংঘাতিক বিমান দুর্ঘটনা। আয়েশার মনে প্রশ্ন জাগে– আগের বিল্ডিং এর আগুনটা তবে কীসের? বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার? পর্দায় লেখা উঠল– 'Plain crash in twin tower'। একই সাথে দু'টো প্লেন পরপর, পাশাপাশি দু'টো বিল্ডিং এ বিধ্বস্ত হলো। এ ও কি সম্ভব! বি.বি.সি. চ্যানেলে স্থির বসে থাকে আয়েশা। দেখতে থাকে আগুনের ভয়ঙ্কর জ্বলন। একটু পরেই পর্দায় লেখা ভেসে উঠল– 'Terrorism attack in America'। আঁৎকে উঠল আয়েশা। সে কী! তবে দুর্ঘটনা নয়? কারা এমন সর্বনাশ করল? তার ছোট চাচার কী হলো? ভাবনা এখন ভয় ও দুশ্চিন্তার ভূত হয়ে আয়েশার ঘাড়ে চাপল। দ্বিতীয় 'আম্মা' চিৎকারে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল আমেনা বেগম।

১২ সেপ্টেম্বর সকালের দৈনিকে পুরো বিষয় পড়ে আয়েশার কপালে বালুচরির দাগ। এই ঘৃণ্য ধ্বংসযজ্ঞের জন্য লাদেনকে সন্দেহ করছে আমেরিকা। হাতে অস্ত্রসহ লাদেনের ছবি ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। লম্বা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি, ক্রুর দৃষ্টির লোকটাকে সত্যি তার ঘৃণ্য মনে হলো। মনে হলো লাদেন মুসলমান নয়, সন্ত্রাসী। রাতে ভালো করে ঘুমুতে পারে নি আয়েশা। ছোট চাচার সেই ছবিটা সারারাত বারবার করে দেখেছে। তার ছেলেবেলার বহু স্মৃতি ছোট চাচাকে ঘিরে। কত শত আবদার। গ্রামে গেলে সারাটা সময় ছোট চাচার সাথেই ঘুরে বেড়াত। মনে পড়ে শাপলা ফুল তুলতে গিয়ে ছোট চাচার সে কী করুণ অবস্থা। তালুকদারদের এঁদো

পুকুরের মাঝখানে লাল শাপলা ফুটেছিল। তোলার জন্যে বায়না ধরেছিল আয়েশা। ছোট চাচা সাঁতার জানত না ভালো। শেষে ডুবে মরে প্রায় আর কী?

পাশাপাশি একশো দশতলা দু'টো বিশাল বিল্ডিং দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল যেখানে, সেখানে এখন শুধুই এক ভয়ঙ্কর শ্মশান। ধ্বংসস্তূপের নিচে পোড়া, ছিন্ন-ভিন্ন মানুষের লাশ; জীবিতের আর্ত-চিৎকার ধোঁয়া হয়ে ঢেকে দিচ্ছে গোটা আকাশ। বিশাল এক বিভীষিকাময় শূন্যতা চারদিকে। মনের অজান্তেই আয়েশা থুক্ করে থুতু ছিটিয়ে দেয় লাদেনের মুখে। মনটা খুব অস্থির লাগছে। ছোট চাচার কোনো খবর পাওয়া যায় নি তখনও। সারা বিশ্বের যোগাযোগ বন্ধ আমেরিকার সাথে। টি.ভি. আর পত্রিকার পাতায় ছোটাছুটি।

কলিং বেল বাজার সাথে সাথেই আয়েশা ছুটে যায় দরোজায়। ঘুম থেকে উঠেই আব্বু গেছে ফোনের দোকানে তার চাচার খবর নিতে। আব্বু এসছে ভেবেই উৎকণ্ঠায় ছুটে যাওয়া। দরোজা খুলল। সামনে দাঁড়ানো লাদেন। চিৎকার দিয়ে উঠেছিল প্রায়। সামলে নিয়েছে। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সে বুঝতে পারে– ও সাদেক। সে ভাবল, সে ভুল করছে, ও সাদেক। কিন্তু কোনো ভাবেই মাথা থেকে তাড়াতে পারছিল না লাদেনের ভূত। ছবির সাথে হুবহু মিল। যাকে দেখে সবচেয়ে খুশি হবার কথা, তাকে দেখে সবচেয়ে আঁৎকে ওঠে আয়েশা। এর আগে কখনও সাদেককে এভাবে ভাবে নি আয়েশা। সাদেকের মুখটা হিংস্র মনে হয় তার। সাদেককে কোনো ভাবেই লাদেন থেকে পৃথক করতে পারছে না আয়েশা। লাদেনের মুখটা সেঁটে আছে সাদেকের মুখে।

কিছুক্ষণ বাদে তার আব্বু ফেরে। বিষণ্ন। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। কোনো খবর নেই। যোগাযোগ সম্ভব হয় নি। বাসায় নিস্তব্ধতা। শোকের ছায়া। সাদেকের সাথে আজ তেমন ভালো করে কথা বলে নি আয়েশা। এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে। সহ্য হচ্ছিল না তাকে। মনকে বুঝাতে চেয়েছে বারবার। ব্যর্থ হয়েছে। কেমন এক সঙ্কোচে কাছে ঘেঁষে নি। সাদেক চলে যায় এক সময়। কিন্তু ফেলে যায় ভৌতিক ছায়া। দিন গড়ায় সন্ধেয়, সন্ধে রাতে; রাত সকালে। এভাবে কয়েকদিন। আয়েশার স্বপ্নে রাহুর কালো ছায়া।

আমেরিকা নিশ্চিত করে বলছে– লাদেনই দায়ী। ছোট চাচার কোনো খোঁজ মেলে নি। মনে হয় লাদেনই ছোট চাচার খুনি। লাদেন যেন বর্বরতার প্রতীক। কিন্তু আশ্চর্য! লাদেনের প্রতি উত্তরোত্তর ঘৃণা বৃদ্ধির সাথে সাথে সাদেকের প্রতিও তার ঘৃণা বেড়ে যায়। যতবার লাদেনের মুখ মনে করে, মানসপটে ভেসে ওঠে সাদেকের চেহারা। আবার যতবার সে সাদেকের মুখ মনে করে, চেতনায় ভেসে ওঠে লাদেনের ছবি। লাদেন আর সাদেক যেন এক। এক হয়ে মিশে যায় তার চেতনায়। এবং সমস্যাটা জটিল আকার ধারণ করে।

আয়েশা টের পায়– তার ভেতরে একটা পরিবর্তন হচ্ছে। ঘৃণার যে বিষবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে মনের গভীরে তা আজ মহীরুহ। আগে যে আসত বসন্তের সুবাতাস হয়ে, আজ তাকে প্রভঞ্জন মনে হয়। যে এলে দেহ মনের কানায় কানায় আনন্দ উপচে পড়ত, সে এলে আজ ঘৃণা জাগে; যে এলে সমস্ত আকাশ জুড়ে খুশির বৃষ্টি নামত, আজ তার আসা অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করে। প্রশ্ন জাগে– কী করে তার সাথে সহজ হওয়া যায়? মনকে বুঝায়। মন শোনে না মনের কথা। শাঁখের করাতের মতো কাটতে থাকে দিনরাত।

সেদিন সন্ধেয় মাকে ডেকে বলে– আম্মা, বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দেয়া যায় না? মা আমল দেয় না; আব্বু শুনে হাসে– কেনরে? কী হয়েছে? ঝগড়া করেছিস সাদেকের সাথে?

– না, কী যে বলো? বলছিলাম; এ সময়; তাছাড়া চাচার কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

ছোট ভাইয়ের প্রসঙ্গ ওঠায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যায় আবু হোসেনের। তবু বলে–

– তারিখ পাল্টানো ঠিক হবে না। সব আয়োজন প্রায় শেষ।

আয়েশা নিশ্চুপ হয়ে পড়ে। তার মনে হতে লাগল– সাদেকই তার ছোট চাচার খুনি। সাদেকের মুখটা ক্রমশ হিংস্র থেকে হিংস্রতর হয়ে ওঠে তার কাছে। বিয়ের দিন দুই আগে বেঁকে বসল আয়েশা, কিছুতেই সে বিয়ে করবে না সাদেককে। নানা জনের নানা 'কেন' প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পেল না কেউ আয়েশার কাছে। তবে

আয়েশার শত 'না' ধোপে টিকল না কারো কাছে। বিয়ের সমস্ত আয়োজন শেষ। বাকি মাত্র আর দু'দিন। এমন পাগলামির কোনো মানে হয় না এ সময়।

হাতে দামি হীরের আংটি। এনগেজমেন্টের আংটির দিকে তাকিয়ে আয়েশার মনে হয়, ওটা সর্বনাশের পরওয়ানা। এক দুঃস্বপ্নের আতঙ্ক। ওটা ভয়ঙ্কর কোনো বিষাক্ত সুতানালী সাপের মতো জড়িয়ে থাকে আঙুলে। বিষ ঢালে। তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে। বিধ্বস্ত করে। আঙুল থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়। পারে না। খুলে ফেলাও সম্ভব হয় না। পরে থাকাও অসম্ভব। অবশেষে বিয়ে হয়ে গেল নির্ধারিত তারিখেই।

গোলাপ ফুলের পাপড়ি দিয়ে সাজানো বাসর। সারা বিছানায় ছিটানো অগণিত লাল লাল গোলাপের পাপড়ি। দরোজা বন্ধ হবার পর তার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। মনে হলো– লাদেন যেন তার মুখোমুখি। মনে হলো– তার সামনে তার চাচার হত্যাকারী। সহ্য হচ্ছিল না। ঘুম আসছে বলে শুয়ে পড়ল আয়েশা। বাতি নিভিয়ে ডিম লাইট জ্বেলে সাদেকও শুয়ে পড়ল পাশে। আয়েশার রহস্যময় আচরণে কিছুটা বিস্মিত হলো সাদেক। ক'দিনের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল দু'জনই।

রাত যখন নিঝ্‌ঝুম, সবাই ঘুমিয়ে; আয়েশা উঠে রান্নাঘরে যায়। প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছে তার। মনে হয় কতদিন যেন পান করে নি ঠাণ্ডা পানি। জগ থেকে এক গেলাস পানি ঢেলে ঢকঢক করে গিলে ফেলে। মনের ভেতর অস্থিরতা। তাকিয়ে দেখে পাশেই ফল কাটা ধারাল একটা ছুরি। কী মনে করে ফল কাটা ছুরিটা হাতে নিয়ে ফিরে আসে বিছানায়। সাদেকের সামনে এসে দাঁড়ায়। সাদেক নয়, যেন লাদেন। আবার মনে হয় সাদেক। মুখটা ক্রমশ সাদেক লাদেন অদল বদল হতে থাকে। দু'টো মুখ মিলেমিশে কেমন একটা নেকড়ের মুখের আদল পায়।

মনে হয়– এ সভ্যতার শত্রু, মানবতার শত্রু। ভীষণ ঘৃণা জাগে। কী এক আক্রোশে ফুঁসে ওঠে আয়েশা। শক্ত মুঠোয় ধরে আচমকা সাদেকের গলায় বসিয়ে দেয় ছুরিটা। সাদেক চিৎকার দিয়ে ওঠে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে। সারা বিছানা রক্তে ভেসে যায়। সাদেকের মুণ্ডুটা পড়ে থাকে একপাশে। বীভৎস এ দৃশ্য দেখে চিৎকার দিয়ে ওঠে আয়েশা।

ধড়মড় করে উঠে বসে। বিছানায় লাল ছোপ ছোপ রক্ত। রক্ত নয়, গোলাপ পাপড়ি। পাগড়িটা খোলা, বালিশের একপাশে পড়ে আছে কাটা মুণ্ডুর মতো। নিথর।

সিডর

পোনা নদী পেরুতেই ঘণ্টা দুই লেগে গেল যেন কী কারণে লতিফ মাঝির। ভাণ্ডারিয়া বন্দর থেকে ভাঁটির সময়েও এক ঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়। আসলে কিন্তু বৈঠাতে আধা ঘণ্টার পথ। কিন্তু আজ লতিফ মাঝির লেগে গেল প্রায় ঘণ্টা দুই। হাতে তো তার ঘড়ি নেই। তাই অনুমান করে নেয়া। গন্তব্য তার নাজিরপুরের ঘোষকাঠি। ওই গ্রামেই বাড়ি। রওনা দিয়েছে সকাল দশটায়। বিকেল পাঁচটা/ছ'টার মধ্যে পৌঁছে যাবার কথা। 'বাতাসের যা খ্যাপামো তাতে রাইত কত অয় ক্যাডা জানে? এটুকু আসতেই ঘণ্টা দুই। টেলিভিশনে নাকি বারবার খবরে বলতি লাগছে দশ নম্বোর বিপদ-সঙ্কেত। রাইত দশটায় উপকূলে আঘাত হানবে। নদীকূলের মানুষ হ্যারা, হ্যারা কি আর টেলিভিশনে ভয় পায়? ওরহম কত কতা টেলিভিশনের মাইনসে কয়, কয়ডা ফলে? ঝড়ের সাথেই হ্যারা পাঞ্জা লড়ে, হ্যারা যদি ঝড়কে ডরায় তাইলে কি চলে'? ছপ্ ছপ্ বৈঠা ফেলে আর লতিফ মাঝি ভাবে। বৈঠার তালে গান ধরতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কী কারণে যেন গান আসে না। যবের ছাতুর মতো গলায় আটকে থাকে। আকাশটা যেন কেমন গোমরামুখো হয়ে আছে। নদীর মতলবটাও ভালো ঠেকছে না আজ। হাওয়া যেন খাম-খেয়ালিপনায় মেতেছে।

পাশের বাড়ির সেলিম ভাণ্ডারিয়া কলেজের প্রফেসর। কলেজের কাছেই ভাড়া বাসা। এক তলা দালান। মাসের চালটা বাড়ি থেকেই আনে। ওই লতিফ মাঝিই আসে চাল নিয়ে। আসার সময় ক্ষেতের কলাটা, মুলোটাও সাথে করে নিয়ে আসে। এবারেও এসেছিল। সেলিম নিষেধ করেছিল ফিরে যেতে। আকাশের যা অবস্থা। আজ রাতটা থেকে যেতে বলেছিল। কথা শোনে নি। বাড়ি থেকে ফোন এসেছিল সেলিমের কাছে। বলে দিয়েছে, আজই ফিরবে। এমন কত ঝড় তার দেখা। অত ডর করলে কি চলে? তা ছাড়া ঝড়-বাদলে ডিঙা বাওয়ায় আলাদা একটা জোস্ আছে। এ অভিজ্ঞতা দশ গুণ বাড়িয়ে, রঙ মাখিয়ে বর্ণনা করার মধ্যে আলাদা একটা সুখ আছে, অহঙ্কার আছে। একজন ট্রাক ড্রাইভারের জীবনে কে কয়টা এ্যাক্সিডেন্ট করেছে, কে কয়টা লোককে চাপা দিয়েছে– তাতে যেমন প্রমাণিত হয় সে কেমন পাকা ড্রাইভার, একজন মাঝির জীবনেও কে কয়টা উন্মাতাল ঝড়ে পড়েছে, কতবার নৌকা ডুবেছে– এ সব তার পাকা মাঝিত্বেরই নিদর্শন। একজন মাঝির জীবনে এ সঞ্চয় কম নয় মোটেই। ঝড়ের আভাস লতিফ মাঝিকে যেন উৎসাহ যোগায়। একটু ভয়ভয় করলেও ভেতরে ভেতরে সে উল্লসিত না হয়ে পারে না।

বেলা আন্দাজ দুপুরে কচা নদীতে পড়ল লতিফ মাঝির ডিঙা। মেঘের ঘটায় বেলা বোঝার উপায় নাই। সুন্দুরী কাঠের ছোট্ট নাও। নিজের হাতেই তৈরি হোগলার ছই। চার/পাঁচ জন লোক ধরে। নাওটা তার নিজেরই। ওই ডিঙা বেয়েই লতিফের দিন গুজরান। নদীর দেশের মানুষ সে। জমি-জমা খুব একটা নেই। শেখে নি অন্য কাজও। দিন-রাত তাই নৌকা বাওয়া। নদীই জীবন, নদীই মরণ। ধার-কর্জ করে তাই এই ডিঙাটা বানানো। ডিঙা বেয়ে যা পায় তা দিয়ে চাল, ডাল, তেল, নুন কিনে ফেরে সন্ধেয় কিংবা রাতে। দুই মেয়ে আর এক ছেলে নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে পরিবার। জলের মানুষ ডাঙায় ফিরলেই তাদের সুখ। ডাঙাকে বিশ্বাস আছে, জলকে নাই। তাই ঘরে না ফেরা পর্যন্ত লতিফের জন্য চিন্তা তার বউ-বাচ্চাদের।

কচা নদী তখন সুমুদ্দুর। কূল-কিনারা নাই। বলগ ওঠা দুধের কড়াইয়ের মতো নদী যেন ফুলেফেঁপে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ মোষের গোঁৎলানি। ঢেউগুলো বেখেয়ালি টিলার মতো। স্রোত যেন জেট বিমানের মহড়া, কত তাড়াতাড়ি সমুদ্রে পৌঁছানো যায়, তারই পাল্লা। জংলি বাতাসে মত্ত হাতির তেজ। কচা নদীতে পড়তেই কলার ঠোঙার মতো নাচতে শুরু করল লতিফ মাঝির ডিঙা। মত্ত-মাতাল স্রোতের দুলুনি। তাতেই ডিঙা ভাসাল লতিফ মাঝি। স্রোতের সাথে নৃত্যে মাতে ছোট্ট ডিঙা। দুরন্ত ষাঁড়ের পিঠে যেন লতিফ মাঝির ডিঙা। ভয়-ভাবনা আর উচ্ছ্বাস মিলে সে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া। লতিফ মাঝি যেন জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে নামে। মহাঝড়ের আর একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আশায় সে উথাল-পাথাল নদীতে নৌকা ভাসায়। লক্ষ করে সে ছাড়া আর কেউ নেই নদীতে। সে একা।

মাঝ নদী না পেরুতেই টের পেল নাও তার উল্টো চলে। কথা শোনে না। পোষ না মানা ঘোড়ার মতো লাফিয়ে ছোটে। দ্রুত ছুটে চলে চরখালির দিকে। স্রোতের বেগ না যেন অজগরের টান। উথাল পাথাল ঢেউয়ে টাল মাটাল লতিফ। ডিঙা যেন ডিগবাজি খায়। দুরন্ত দস্যি ছেলের মতো শূন্যে লাফিয়ে উঠে নিচে পড়ে। সে যেন পাগলা ঘোড়ার সওয়ার। যেন চুরমার হয়ে ভেঙে যাবে ডিঙা যে কোনো সময়। ঝড়-জল-স্রোত তাকে ভাসিয়ে নেয় অন্য পারে। সূর্য ডুবে গেছে। আলো নিভে গেছে। ঝড়ের তাণ্ডব বেড়েছে। অন্য পারের তীরে ধাক্কা খেতে খেতে নৌকা চলে সাগর পানে। বাগ মানে না। ভাঙনের মুখে কিনারে দেখতে পায় এক নারকোল গাছ। লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। গাছ বেয়ে কিছুটা উঠে দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে ফেলে নিজকে নারকোলগাছের সঙ্গে। দড়ি তার নৌকোতেই ছিল। নৌকো এবার নদীর সাথি। ছুটে চলে চলার বেগে।

সন্ধে নাগাদ পৌঁছে যাবার কথা ঘোষকাঠি। সন্ধে উৎরে কৃষ্ণকালো রাত। লতিফ ফেরে নি। বৌ-বাচ্চা চিন্তিত। আকাশ ফুটো হয়ে বৃষ্টি ঝরে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় খড়ের চালাটা উড়িয়েই নিয়ে যাবে মনে হয়। বাচ্চাদের খাইয়ে লতিফের অপেক্ষায় বসে থাকে তার বৌ। পাকা পাকা সফেদা আনার বায়না ধরেছিল ছেলেটা। মেয়েরা বলেছিল আলতা আর চুড়ি আনতে। তারা জেগে বসে আছে আব্বু আসবে বলে। বাড়ির পাশের দোকান থেকে ফোন আসে সেলিমের কাছে। সেলিম জানিয়ে দেয় সকাল দশটায় রওনা হয়ে গেছে। খবর এটুকুই। এ খবরে আশ্বস্ত হবার বদলে শঙ্কিত হয় লতিফের বৌ। সকাল দশটার মানুষ রাত দশটাতেও ফেরে না। এরপর আর স্থির থাকা কঠিন। কিন্তু করার কিছুই থাকে না। ঝড়ের কাছে সে অসহায়। মনটা কু গাইছে। কী জানি কী হয়?

চিন্তা সবার। দমকা হাওয়ার বেগ পলে পলে বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ে চিন্তা। ঘনঘোর অন্ধকারে ঢেকে ফেলেছে ভাণ্ডারিয়া বন্দর। বিদ্যুৎ বন্ধ। প্রেতপুরীর মতো শহর। শুধু শো শো শন্ শন্ মড়ু মড়ু শব্দ শোনা যায়। বাইরে শব্দ আর ঘরে নৈঃশব্দ। মৃত্যুর নৈঃশব্দ ঘিরে ধরে প্রতিটা ঘর। জানালা-দরজা বন্ধ। কোথায় কী ঘটছে তা জানার বা বোঝার কোনো উপায় নেই। জানালা খুললেও অন্ধকারে বাইরে কিছু দেখা যায় না। শুধু বাজ পড়লে গাছগুলোর তাণ্ডব চোখে পড়ে। তবে ভয়ঙ্কর কিছু যে হতে চলেছে, অনুমান করে নেয়া যায় তা। প্রাণ মুঠোয় করে মুহূর্ত পার করে মানুষ।

রাত দশটা নাগাদ শব্দটা প্রকট হয়। সমুদ্র বুঝি ছুটে এসেছে বারান্দায়। হাজার সাপের হিস্ হিস্ ফোঁসানি বুকে কাঁপন ধরায়। ঘুম নেই কারো চোখে। জানালায় চোখ রাখতে বিছানা ছেড়ে খাটালে পা রাখে সেলিম। চমকে ওঠে। পায়ে হিম হিম মৃত্যুর ছোঁয়া। পা ডুবে যায় হাঁটু পানিতে। অন্ধকার ঘরে কিছুই ঠাহর হয় নি। দরোজার ফাঁক গলে চোরের মতো কখন যে ঘরে ঢুকেছে হিংস্র পানি কেউ খেয়াল করে নি। চিৎকার দিয়ে ওঠে সেলিম। মোবাইলের আলো জ্বেলে দেখে ঘরের ভেতর পানির উৎপাত। বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে জমে যায়। জানালা খুলে বাইরে আলো ফেলে দেখে দেয়ালের মাথায় উঁকি মারে পানি, গ্রিল ছুঁই ছুঁই। দু'এক ইঞ্চি পেরুলেই হু হু ঢুকে পড়বে ঘরে। বানের পানি। এ অবস্থায় কী করা উচিত ভেবে পায় না সেলিম। লতিফের কথা ভাববারও অবকাশ হয় না তার। হাত-পা অবশ হয়ে আসে। মস্তিষ্কের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী যেন দখল করে নেয় সুশীতল বরফ।

বিদ্যুৎ নেই। টেলিভিশনের খবর বন্ধ। মোবাইলে নেটওয়ার্ক নেই। সমস্ত পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ঝড়ের যা তাণ্ডব বেরুনোর উপায় নেই। কিচ্ছু জানা-বোঝার নেই। যেন জানা বোঝার আর দরকার নেই। শেষ হয়ে গেছে সব। ফুরিয়ে গেছে যেন পৃথিবীর সব আয়োজন। সব প্রয়োজন। কোন্ কেয়ামত চলছে কেউ জানে না। কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ। সেলিমের জিভটা যেন খটখটে শুকনো একটা টোস্ট। মৃত্যু বুঝি খুব দূরে নয়। সব প্রস্তুত মৃত্যুর আয়োজন। দরোজায় পানির চাপ। কড়া নাড়ে সিডর। খোলা সম্ভব নয়। খুললেও লাভ নেই। সারা ঘর ভেসে যাবে স্রোতে। উভয়-সঙ্কট। সেলিমের স্ত্রী যেন পাথরের ভাস্কর্য। তিন বছরের ছেলেটা বিছানায় কাতরায়। ছাদে ওঠারও কায়দা নেই। তামাম অন্ধকার চিরে শুধু এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময় শব্দ।

পৃথিবীর সব ক'টি টিভি চ্যানেল যেন এক সাথে মিলেমিশে বেজে উঠেছে ইথারে ইথারে, যার থেকে কোনো শব্দ বা ছবি এককভাবে আলাদা করা যায় না। এ এক বীভৎস আওয়াজ।

ভোর হয়। অন্ধকারে যেমন সমুদ্র এসেছিল ঘরে, তেমনি অন্ধকারেই আবার মিলিয়ে গেছে। সমুদ্র এসেছিল ভয়ঙ্কর তেজে, দস্যুর মতো; যাবার বেলা চুপি চুপি চোরের সদৃশ। সারা রাত বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো বিভীষিকার মধ্যে কাটিয়ে সকালে আশার আলো দেখে সেলিম। ভয় কেটে গেছে। রয়ে গেছে বিভীষিকার চিহ্ন। প্রেতপুরীর মতো চারদিকে অনেক ধ্বংস, অনেক মৃত্যু। সব লণ্ডভণ্ড। গাছগুলো উপড়ানো। ঠোঙার মতো এখানে সেখানে পড়ে আছে টিনের চালা। খানা-খন্দে জমে আছে শান্ত জল। এখানে সেখানে পড়ে আছে কুকুর বেড়াল মানুষের লাশ। বিপদগ্রস্ত মানুষ। কিন্তু সেলিমরা বিপদমুক্ত। দুশ্চিন্তা একটাই, লতিফ মাঝির খোঁজ জানে না কেউ।

ঝড় থেমে গেলে স্বজনহারার দল ভোরেই বেরিয়ে পড়ে স্বজনের খোঁজে। স্রোতে ভাসা লাশ দেখে টেনে তোলে পাড়ে। শনাক্ত করতে ঝুঁকে পড়ে লাশের মুখে। চেনাজানা হলে আহাজারিতে গগন বিদীর্ণ করে। অচেনা হলে পাশে ফেলে রাখে কারো অপেক্ষায়। স্বজনের খোঁজ না পেলে মাটি খুঁড়ে কবর দেবে তারাই। ভাঙনের কিনারে ভেসে থাকা একটা নারকোল গাছ দেখতে পেয়ে এগিয়ে যায় কাছে। উৎসুক জনতা দেখে গাছের সাথে কেউ একজন বাঁধা রয়েছে দড়ি দিয়ে। ভেসে আসা গাছের সাথে ভেসে আসা মানুষ। নেমে যায় নদীতে। বাঁধন খুলে তুলে আনে পাড়ে। সবাই ঝুঁকে পড়ে মুখে। শনাক্ত করতে চেষ্টা করে।

লতিফ মাঝিকে কেউ চেনে না এ গ্রামের। কেউ চেনে না এ পৃথিবীর। কেউ জানে না তাকে। জানে না তাও– সে কি জীবিত না মৃত। নাকি জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে ঝুলন্ত পেন্ডুলাম। নদীর মানুষ, নদীর মাছের মতো পড়ে থাকে কিনারে। কেউ কেউ বলে ওঠে– ভিনদেশি লাশ।

নিষ্পলক চোখ জোড়া তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। মনে হয়, এক মনে সে আকাশ দেখছে বিস্ময়ের সাথে। একটু আগে, রাতে যে আকাশে কালো কালো মেঘ ছিল, ঝড় ছিল; ছিল উথাল-পাথাল মত্ততা; এখন সেখানে শান্ত নীল শূন্যতা। এই আকাশ এত উদার, সে-ই আবার কী ভয়ঙ্কর? আকাশ দেখে ভিনদেশি লাশ। কিংবা সে দেখে না কিছুই। সবার দেখার ভুল। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে যেন একটু নড়ে ওঠে। কিংবা নড়ে ওঠে না। কালো পর্দার ওপার থেকে জীবন যেন উঁকি মারে। কিংবা মারে না। তারপর চোখ বোঁজে। চোখটা হয়ত বোঁজাই ছিল।

সোনাঝুরির সন্ধ্যা

সন্ধ্যাগুলো এমন মায়াবী হয়, তখনও কি জানত শশাঙ্কমোহন? হয় মোহনীয়? তখন আর এখন কত তফাৎ? একই সন্ধ্যা, অথচ এক নয়! ভিন্ন। অন্য। সেই আর এই, এক নয়। অথচ এক। সবই আছে ঠিকঠাক। সেই দিঘি। সেই সোপান। সেই বাঁধানো ঘাট। বকুল। বকুলের ফাঁকে সেই পাখি। প্রান্তর। দূরের নদী। সূর্যাস্তের মায়াবী আভা। গোধূলি। সবই আছে। সব। অথচ কী যেন নেই। নেই? তখনও কি ছিল? স্মৃতিগুলো সুতানালী সাপের মতো শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে যায় চেতনায়। কেমন অবশ করে।

শেষ চৈত্রের দিন ছিল সেদিন। আজ বিজয়া দশমী। আজও সেই মায়াময় দিন। মাঝে এক সময়ের স্রোত। দিনগুলো হারায় না আসলে; ধূপের ধোঁয়া হয়ে ঝুলতে থাকে। স্মৃতিতে। জ্বলতে থাকে। হৃদয়ে। ভেবে পায় না শশাঙ্ক– কী করে একটা গান বদলে দিতে পারে একটা মানুষকে! একটা জীবনকে! কী করে একটা সুর চুপি চুপি বুকের ভেতর ঢুকে পারে বন্যার মতো প্লাবন বহাতে। সামান্য একটু হাওয়া কী করে ঝড় হয়? কী করে কোনো হৃদয় হয় জলোচ্ছ্বাস?

গ্রামেরই এক স্কুল শিক্ষক শশাঙ্কমোহন। বাংলার শিক্ষক। গ্রামের নাম বোলপুর। সোনাঝুরি গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তির মেলা। সে উপলক্ষ্যেই যাওয়া তার সোনাঝুরি গ্রামে। বেড়াতে। বোনের বাড়ি। চৈত্রের শেষ দিন। বছরের শেষ বিকেল। মেলায় গেল বোনের সাথে। সাথে বোনের ননদ, মিতা। মিতার বান্ধবীরা। একদল কলেজ পড়ুয়া যুবতী।

ভালো বাঁশি বাজাতে জানত শশাঙ্ক। একটা বাঁশি উপহার দিল মিতা। শশাঙ্ক দিল সবাইকে একটি করে রুমাল। সন্ধের আগেই ফিরল তারা। বাড়ির পাশেই বিরাট একটা দিঘি। বাঁধানো ঘাট। মায়াময় সন্ধেয় সবাই ধরল এখানে বসতে হবে এবং বাঁশি বাজাতে হবে। শশাঙ্করও ভালো লাগল পরিবেশটা। দূরে পশ্চিমে সূর্য ঢলছে। ফাঁকা মাঠের দূরে তালবন। ফাঁকা ফাঁকা গাছ জমির ভেতর নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে। তার মাথা ছুঁয়ে উড়ে ফেরে ধূসর ডানার পাখি। বড় অদ্ভুত সুন্দর ছিল সন্ধে। রান্না করার কারণ দেখিয়ে বসল না বোন। চলে গেল। শশাঙ্ক তার পাঁচ বছরের ছোট। খুব আদরের। বি.এ. পাস করেই সবে হাইস্কুলে ঢুকেছে। শিক্ষকতা পেশা তার ভালো লাগে।

পূরবীর সুরে বাঁশি বাজাল শশাঙ্ক। মিতা আর তার বান্ধবীরা বিমুগ্ধ শুনল। পাশের বাড়ির সুনন্দা কলেজের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। কিছুটা লাজুক। গানের গলা ভালো। সবার অনুরোধে গাইতে হলো। বেশ মিষ্টি সুর। চিত্রা সিঙের গাওয়া একটি গান 'মনে কর যদি সব ছেড়ে হায়, চলে যেতে হয়, কখনও আমায়, মনে রবে কি?' শোনাল। এরপর নানা হাসি তামাশা এবং গল্প শেষে ঘরে ফেরা।

সেদিনের সেই সন্ধের স্মৃতি কোনোই রেখাপাত করে নি শশাঙ্কর মনে। এ যেন হেমন্তের বুনোপথে চলার পাশেই দৈবাৎ ঝরে পড়া একটা হলুদ পাতা। কয়েকটা বছর কেটে গেল, যেভাবে যায় কেটে। মাঝে অবশ্য দু'একবার সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য গেছে সে বোনের বাড়ি। মিতার বিয়ের সময়ও গেল। অবশ্য সেদিন বিয়েতে সেই সন্ধেয় তার সব বান্ধবীরা উপস্থিত ছিল কি না তা খেয়াল করে নি শশাঙ্কমোহন। সন্ধেটা খুব মনোরম হলেও অত দাগ কাটে নি মনে। সব বান্ধবীর কথা তাই শশাঙ্কর মনেও ছিল না। কারো কারো তো বিয়েও হয়ে যেতে পারে? মনে থাকার কথা নয়।

আবার যথারীতি স্কুল। ক্লাস। ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে সময় কাটানো। বাবা-মা যে মাঝে মধ্যে বিয়ের তাগাদা দেয় নি, এমন নয়। সামান্য বেতনে বিয়ে করার সাহস হয় নি। তাছাড়া বিয়ে জিনিসটার প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণা ছিল শশাঙ্কর সব সময়। অহেতুক ভীতিও হতে পারে। তবুও বাবা-মা'র পেড়াপেড়িতে শেষমেশ রাজি হতে হলো। একটা ভালো পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল। গ্রাম কানুয়া। দীর্ঘাঙ্গী। সুশ্রী। গায়ের রঙ শ্যামলা। মেয়ের বাবা দীননাথ বাবু অবসরপ্রাপ্ত প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। তীর্থা ভাণ্ডারিয়া কালেজের বি.এ. ক্লাসের ছাত্রী। অপছন্দ হবার কোনো কারণ নেই। দু'পক্ষেই কথাবার্তা চলল। অবশেষে পাত্রের পাত্রী দেখার পালা।

সে ছিল চৈত্রের শেষ দিক। ক'দিন পরই বৈশাখ। বৈশাখেই বিয়েটা সেরে ফেলার ইচ্ছে সবার। মেয়েকে দেখে এবং কথা বলে ভালোই লাগল শশাঙ্কর। তখনও পাকা কথা হয় নি দেয়া। খাওয়া শেষে কথা পাকা করে তবেই বিদায়। তীর্থা নাকি সুন্দর গান জানে। অতএব সবাই গান শুনতে চাইল। শুধু হারমোনিয়ামেই গাল ধরল–

'মনে কর যদি সব ছেড়ে হায়, চলে যেতে হয়, কখনও আমায়, মনে রবে কি?'

গানটা শুনে কেমন যেন হয়ে গেল শশাঙ্কর অনুভূতি। কেমন এক শিহরণ খেলে গেল সমস্ত শরীরে। ভেতরে একটা স্মৃতির চরা যেন জেগে উঠল বর্ষার ভরা গঙ্গায়। সেই সন্ধেয় একটি মেয়ে– আজ আর তার নামও নেই মনে, গেয়েছিল একটি গান। এই গান। হৃদয়ের সমস্ড় দরদ ঢেলে। গেয়েছিল– 'মনে কর, যদি সব ছেড়ে হায়' স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেই ধূসর স্মৃতি। চেহারাটাও মনে পড়ছে তার। শুধু নামটাই গেল হারিয়ে ওই স্মৃতির প্রান্তরে। কোথায় বসেছিল, মনে পড়ছে। কেমন করে গাইছিল, মনে পড়ছে। তার চুলের ফাঁকে কোথায় আটকে ছিল সদ্য ঝরা এক শুভ্র বকুল, মনে পড়ছে। সবই মনে পড়ছে তার। কী আবেদনময়ী গান! সুর!! ও গান কি তার হৃদয়েরই আবেদন ছিল? তাতো সে কখনও চেষ্টা করে নি বুঝতে। আশ্চর্য! এ ক'বছরে একবারও ভাবে নি সে মেয়েটিকে। একবারও মনে পড়ে নি সে মুখ। এমন কি মিতার বিয়ের সময়ও না। এখন মনে পড়ছে– মিতার বিয়ের সময় সে ছিল না উপস্থিত। তাহলে কি তার বিয়ে হয়ে গেছে? ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা। যেন তপ্ত কড়াইয়ে ক্রন্দনরত রাঁধুনীর এক ফোঁটা অশ্রু। না। তা নয়। একটা জ্যান্ত কই মাছ। সেই মাছটা শশাঙ্ক নিজে। মনে হচ্ছে– সে যেন জ্বলন্ত কড়াইয়ে দাপাচ্ছে এক জ্যান্ত কই।

মেয়েটি কি কিছু বলতে চেয়েছিল তার গানে গানে? কী বলেছিল? ভালোবাসা কি এমনি করেই বলে যায় ভালোবাসার কথা? গোপনে? বুঝতে পারে না বেরসিক প্রেমিক! হায় ভালোবাসা!! ভেতরটা ছটফট করে উঠল শশাঙ্কর। দেখতে ইচ্ছে করল সেই মেয়েকে। জানতে ইচ্ছে করছে– তার কি বিয়ে হয়েছে, না কি এখনও . . .? মিতার বিয়েতে যে এল না ওই মুখ? তাহলে কি . . .? ভাবতে বড় কষ্ট হচ্ছে শশাঙ্কর। আবার বুঝাচ্ছে নিজেকেই নিজে– কী আছে সে সামান্য ঘটনা মনে করে কষ্ট পাবার? তার কথা তো ভুলেই ছিল সে। তাছাড়া এমন কোনো সম্পর্ক তো দূরের কথা, তেমন কোনো কথাই হয় নি তার সাথে। তাহলে এমন কেন হলো? এমন কেন হয়? ধুলোপড়া তানপুরা ঝাড়া দিলেই তা কেন সেই আগের মতোই বেজে ওঠে টনটনে সুরে? যে সুর থাকে তারের ভেতর ঘুমিয়ে, টোকা পেলেই কেন সে বেজে ওঠে হৃদয় ফাটিয়ে? শশাঙ্ক বলল–

– 'জল খাব'।

ততক্ষণে গান শেষ। তীর্থা নিজেই উঠে জল আনতে গেল। মনের মধ্যে এক মরুঝড় শশাঙ্কর। এ সে কী ভাবছে? তীর্থার গান সে ঠিকমতো শোনেও নি। সে তখন স্মৃতির প্রান্তরে ভরতপক্ষী। উড়ছে। ঘুরছে। দূরে। শূন্যের নীলে। জল খেয়ে বলল–

'গানটা বড় সুন্দর! কার গান এটা?'

তীর্থা– 'চিত্রার। চিত্রা সিং। তার কণ্ঠে শুনেছেন? শুনবেন তার কণ্ঠে? এমন চমৎকার কণ্ঠ! কী এক মাদকতা আছে! তাঁকে সবাই সবুজ সুরেলা বলে।'

শশাঙ্ক– 'রেকর্ডটা আছে এখানে?'

তীর্থা– 'বসুন, শোনাচ্ছি।'

একটু পরেই ভেসে এল সেই মোহনীয় সুর– 'মনে কর, যদি সব ছেড়ে হায়' . . .।

কেবলই ভেসে যাচ্ছে শশাঙ্ক। দূর থেকে দূরে। বিন্দু থেকে বিন্দু হয়ে, শরতের নীলাকাশে। দুপুরের চিল হয়ে। কিচ্ছু ভালো লাগছিল না তার। স্মৃতিতে সেই ধূসর গোধূলি। ধুলো সরিয়ে আজ সে পূর্ণ স্বচ্ছ। সেদিনের সেই সন্ধের ওকথা কি সে মেয়ের মনের কথা? যদি না হয়? এমনও তো হতে পারে যে সে নিছক এক গানই। পরিবেশনের জন্যই গাওয়া। যেমন শশাঙ্ক বাজিয়েছিল আপন মনে পূরবীর সুর। এমনও তো হতে পারে। পারে হতে। তবুও মনে যেন কেমন দোলা দেয় সেই সুর। সেই স্মৃতি। কী জানি? খোঁজ নিয়ে

দেখা যাক। সে ভাবল– বিয়েটা এখন সে করবে না। যাহোক একটা কিছু বলে তারা বিদায় নেবে এখান থেকে। তীর্থাকে তার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু মনে তার অন্য কেউ হঠাৎ বেঁধেছে বাসা। সেই ভুলে যাওয়া তাকে সে পারছে না ভুলতে। এ কেমন? এমনও হয় তাহলে?

বাড়ি ফিরে এক ফোঁটা ঘুমুতে পারল না সে রাতে শশাঙ্ক। এ কেমন কষ্ট! কোথায় ছিল এ কষ্ট এতদিন? কষ্ট কি এমনই শিশির যা কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করে? রাতটা কাটল কোনোমতে। সকালে স্কুলে গেল। মন বসছে না পড়াতে। কয়েকটা ক্লাস করে হেডমাস্টারকে বলে ছুটি নিয়ে চলে গেল সোনাঝুরি। বোন তো এ সময়ে হঠাৎ তাকে দেখে রীতিমতো অবাক!

– এ কী, হঠাৎ তুই? কেমন আছিস্? কোনো দুঃসংবাদ নেই তো বাড়ির? কোনো খবর না দিয়েই চলে এলি?

– না। এমনিই এলাম।

– বলা নেই, কওয়া নেই? তাছাড়া এ সময় তো তোর আসার কথা নয়? সংক্রান্তির তো আরও ক'দিন বাকি?

– কেন, এমনি আসা যাবে না? ইচ্ছে হলো, তাই এলাম। তোকে দেখতে এলাম।

– কিন্তু তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন? কেমন উদভ্রান্ত মনে হচ্ছে।

– ও কিছু না। স্কুল থেকেই চলে এসেছি তো? তাই।

সন্তোষজনক কোনো জবাব দিতে পারল না শশাঙ্কমোহন। তার আসার কারণও পারল না বলতে। কীভাবে বলবে? কী এক লজ্জা তাকে জাপটে ধরেছে। আর কী এমন বিষয় যে বলার মতো? কী এক সঙ্কোচে সে কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারল না সুনন্দা সম্পর্কে। কী এক কষ্ট এবং সঙ্কোচ তাকে আচ্ছন্ন করে আছে।

তখন সন্ধে হয় হয়। ধীর পায়ে শশাঙ্কমোহন চলে আসে সেই দিঘির পাড়। সেই সোপানে এসে বসে সেই বকুল তলায়। এই সে সেদিনেরই সন্ধে। অথচ দুয়ে কত ফারাক। আজ সম্পূর্ণ একা বসে। সেদিন ছিল সাথি। আজ সাথি হারা। সেদিন ছিল আনন্দ। আজ কষ্ট। এমনও কি কিছু কিছু কষ্ট থাকে, যা প্রকাশ করা যায় না? যায় না কাউকে বলা? দিঘির ঘনকালো জলের দিকে সে তাকিয়ে। গাছের ছায়ারা কেমন আবছা হয়ে আসে এই আবছায়া আলোয় ধূসর স্মৃতির মতো। দু'চারটে বকুল তুলল সোপান থেকে আঙুলে খুঁটে। সাথে সাথে ছুঁড়ে ফেলে দিল জলে। জলটা একটুও নড়ল না। প্রকৃতিও যেন আজ বিষণ্ন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল অবশেষে। তখন গাছ এবং শশাঙ্কর ছায়া মিশে গেছে কালো জলের অতলে।

বাড়ি ফিরতেই বোনের বকুনি–

– কোথায় ছিলি এতক্ষণ তুই? এদিকে আমি খাবার নিয়ে বসে। তোর খোঁজ নেই। কতদূর থেকে এসেছিস কষ্ট করে? নে হাত মুখ ধুয়ে নে। ভাত হয়ে গেছে। ভাতই খা এখন। অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই।

হাতমুখ ধুয়ে, খেয়ে আর ভালো লাগল না বসে থাকতে। তাই শুয়ে পড়ল আলো নিভিয়ে। কিন্তু ঘুম এল না। ছটফট করতে লাগল বিছানায় শুয়ে। দূরে কেমন বীভৎস সুরে কাঁদছে একটা কুকুর। শশাঙ্কর কেমন যেন লাগে। উঠে বসে। ইচ্ছে হয় গিয়ে বসে সেই বকুল তলার ঘাটে। অনেক ইচ্ছের মতো এটাকেও অবদমন করতে হয়। আবার শোয়।

শশাঙ্ক দেখতে পায়– বকুল তলা থেকে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে আসে তার দিকে কুণ্ডলি পাকিয়ে। হাওয়ার সে দলাটা ক্রমশ একটা সাপ হয়ে যায়। সাপটার চেহারাটা কিছুটা বকুলতলার সেই মেয়েটার মতো। সাদা। পুরো সাদা। দুধ সাদা। অত সাদা সাপ সে দেখে নি জীবনে কখনও। ঠিক যেন সাদা একটা ফিতা। জিভ দুটো শুধু নীল। সাপটা তার সামনে এসে দাঁড়াল। কেমন বকুল ফুলের মতো তার গন্ধ। সাপটা হাসছে। বলছে– 'কী, চিনতে পারছেন না?' ঠিক যেন সেই মেয়েটির মতো হাসি। কী বলবে শশাঙ্ক, বুঝতে পারছে না। কোনো ভাষা আসে না মুখে। কিছু বলতে চাইছে। পারছে না। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। সাপটা সন্তর্পণে তার শিরায় ঢুকে গেল। মিশে গেল রক্তস্রোতে হিমেল হাওয়ার মতো। ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠল শশাঙ্ক। শব্দ হলো না। কিন্তু, ঘুম ভেঙে গেল। বুঝতে পারল– এ স্বপ্ন। তারপর আর বন্ধ হলো না চোখের পাতা।

সকালে উঠে হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে বিদায় নিল বোনের কাছে। চলে এল বাড়ি। কিন্তু জানা হলো না কিছুই। সঙ্কোচে বলা হয় নি কাউকেই। মেয়েটাকেও দেখে নি। কথায় কথায়ও তো জিজ্ঞেস করা যেত তার কথা? কিন্তু তাও পারে নি সে। কেমন যেন লাগছিল। বাড়ি এসেও ছটফটানি কমল না একটুও। বিয়েটা ভেঙে দিল তীর্থার সাথে। বলে পাঠাল– পছন্দ হয় নি। অথচ তার বাবা-মাও পছন্দ করেছিল তীর্থাকে। কিন্তু এখন তো তার মনে তীর্থা নেই। কোনো এক সন্ধে বেঁধেছে বাসা। তার কী করার আছে?

এরপর কী এক ঘোরে কেটে গেল ছ'টা মাস। একটুও মন থেকে বিদায় নেয় নি সে সন্ধে। একাই সে বয়ে বেড়িয়েছে তার অপ্রকাশিত, গোপন ভালোবাসার কষ্ট। কাউকে বলে নি। জানায় নি। বুঝতেও দেয় নি। আশ্বিনের শেষ। বোনের বাড়িতে দুর্গা পুজো। সে উপলক্ষে আসা। বিসর্জনের আগের দিন এসেছে সে। মিতা এসেছে তার স্বামী-সন্তানসহ। এক মেয়ে। এক ছেলে। ছেলেটা কোলে। কথা শেখে নি এখনও। মেয়েটা যেন রক্তজবার পাপড়ি। ছোট্ট। কেবল হাঁটতে শিখেছে। পরনে লাল ফ্রক। ঠিক রক্তজবা। মিতার স্বামীর সাথে আলাপ হলো। কী এক এন.জি.ও.তে চাকরি করেন। কিন্তু কিছুতেই মন বসছিল না শশাঙ্কর। মাঝে মাঝে রাগ হয় তার নিজেরই ওপর। করুণা হয়। এ কেমন ভালোবাসা? বলা নেই, কওয়া নেই, নামটা পর্যন্ত মনে নেই।

রাতটা কাটল কোনোমতে। পরদিন বিজয়া দশমী। প্রতিমা হলো বিসর্জন। সে ও এক করুণ দৃশ্য। সবাই যে যার মতো কাঁদছে। যেন কেউ মরেছে। শশাঙ্কর মনে হলো– এ লোক দেখানো কান্না। এদিকে শশাঙ্কর ভেতর যে চলছে অহরহ ক্রন্দন, তা কেউ দেখছে না, শুনছে না। তার ভেতর যে নিয়ত চলছে এক দেবীর বিসর্জন, তা কেউ পাচ্ছে না টের। এ মৃন্ময়ী নয়, চিন্ময়ী। অথচ তার খোঁজ কেউ রাখে না। শশাঙ্কর ভালো লাগল না এ সব। তাই ঘরে ঢুকে শুয়ে থাকল বিছানায় সারাটা দুপুর। মাঝখানে একবার বোন এসে দেখে বলল–

– কী রে শরীর খারাপ করে নি তো তোর আবার?

– না।

– তবে যে শুয়ে আছিস অসময়ে?

– এমনিই।

ব্যস। এ পর্যন্তই। তারপর দিন গড়িয়ে সন্ধে। কেন যেন সেই দিঘির বকুলতলা তাকে টানছিল। ধীর পায়ে একাকী চলে গেল ঢাক-ঢোল-ধূপের কোলাহল ছেড়ে। সে চায় নির্জনতা। একটু নিভৃতি। গিয়ে বসল সেই বাঁধানো সোপানে। এটা তার সোনাঝুরির তৃতীয় সন্ধে বকুল তলার ঘাটে। মিতার বিয়েতে এসে এ ঘাটে আসা হয় নি তার। সেদিন আর এদিন কত তফাৎ। আজকের সন্ধেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাতাসে কুয়াশার ঘ্রাণ। সামান্য উত্তরে হিমেল ছোঁয়া। প্রকৃতিতে বিষাদের ছায়া। এমন দিনেই বুঝি বিসর্জন মানায়। দিঘির নিথর কালো জলের তলে যেন কী খুঁজছে সে একা। কী, তা সে জানে না নিজেই।

হঠাৎ চমকে ওঠে শশাঙ্ক। আকাশেও তখন বিজয়া দশমীর অনুজ্জ্বল চাঁদ। সে ও কি চমকে ওঠে ওই পাঁচ পাঁচটা বছর পরে কোনো চেনা কণ্ঠস্বরে? তাকিয়ে দেখে শশাঙ্ক সেই চিন্ময়ী– সেই সাদা সাপ– এ ও কি সম্ভব? পাঁচ বছর আগের সোনাঝুরি, বকুলের সেই প্রথম সন্ধে আজ হঠাৎ এখানে এমন করুণ কণ্ঠে কেন? বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে শশাঙ্কর– এ কি সত্যি, না কি সেই স্বপ্ন? সেই স্বপ্নের দ্বিতীয় বিস্ময়? বিস্ময়-বিমুগ্ধ শশাঙ্ক আঁৎকে উঠে নির্বাক তাকিয়ে রয়েছে সেই মূর্তির দিকে। মূর্তি বলছে–

– 'আপনি! কেমন আছেন?'

ঘোর কাটতে কিছুটা সময় লাগে শশাঙ্কর। মনে হয় এ সেই মেয়ে– সাগরের ওপার থেকে তার সাথে কথা বলছে শুভ্রা সুন্দরী। আবার প্রশ্ন–

– 'আপনি একা একা কী করছেন এখানে বসে?'

এবার সংবিৎ ফিরে পায় শশাঙ্ক। বলে–

– 'হ্যাঁ, এই এমনি। আছি আর কী? আপনি? তা- এতদিন- আপনার- আপনার . . .?'

কেমন জড়িয়ে যাচ্ছিল তার সব কথা। যদি দেখাই হবে এতকাল পরে তবে কেন এমন বেশে দেখা হলো তার সাথে? নিয়তির এ কী করুণ পরিহাস?

শশাঙ্ক উঠে দাঁড়ায়। মুখোমুখি দু'জন। এত সাদা পোশাকের ভেতর গৌরবর্ণ দেহখানা সুনন্দার যেন বিদ্রূপ করে সেই অপ্রকাশিত ভালোবাসাকে। যেন বলছে– বড় দেরি করে ফেলেছো। বড় দেরি হয়ে গেছে। যেন নিষ্পাপ রজনীগন্ধার ডাঁটা সুনন্দা। ধপ্‌ধপে সাদা শাড়িটা যেন তার পাপড়ি। আজ আর তেমন অন্ধকার ফুটল না আকাশে। বিধবা সুনন্দার মতো জ্যোৎস্নাও যেন বিধবা। ধপ্‌ধপে সাদা। ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জ্যোৎস্নায় যেন গা পুড়ে যাচ্ছে শশাঙ্কর। মুখোমুখি সন্ধের দু'জনের ছায়া এসে পড়ছে দিঘির কালো চকচকে জলে। ছায়া দুটো স্পষ্ট স্থির। নিথর। পাখা ঝাপটে উড়ে গেল একটা বাদুড়। কোথাও কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল একটা বাজপাখি। সমস্ত প্রকৃতি যেন বিদ্রূপ করে হেসে উঠল গানটাকে– 'মনে কর, যদি সব ছেড়ে হায়, চলে যেত হয় . . .

ট্যাক্সি-ড্রাইভার

মহাকালের নিস্তব্ধতা ভেঙে লাশটা হঠাৎ কর্কশ স্বরে কথা বলে ওঠে– 'ওস্তাদ, আমারে কই লইয়া যান'?

নিশুতি রাতের তামাম নিস্ড়ব্ধতা চিরে সে আওয়াজ ভয়ঙ্কর বিভীষিকা ছড়ায়। বিনা মেঘে বাজ পড়ার মতোই আওয়াজটা চারদিক বিদীর্ণ করে তোলে। অন্ধকারটা যেন খান খান হয়ে ভাঙা কাচের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ে। কাসেমের একটু ঝিমুনির মতো এসেছিল। হঠাৎ সে ধড়মড় করে ওঠে এবং পিছন ফিরে তাকায়। বুক ঢিব্ ঢিব্ করতে থাকে। দেখে, লাশটা উঠে বসেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। গলা শুকিয়ে কাঠ। হৃৎপিণ্ড বন্ধ হবার যোগাড়। চারদিক সুন্সান্। কোনো জনমুনিষ্যি নেই। এমনকি কুকুর বেড়ালও না। পৃথিবীতে যেন শুধু সে আর ওই লাশ– আর কেউ নাই। বেবিটেক্সির সামনের সিটে বসা চালক কাসেম। আর পেছনের সিটে অজানা অচেনা নাম না জানা লাশ। সামনের সিটে গতি, আর পেছনের সিটে স্থিতি। সামনে জীবন, পেছনে মৃত্যু। লাশটা শোয়ানো ছিল। এখন উঠে বসেছে। লাশের গায়ে জড়ানো সাদা কাফনের কাপড়। এখন চাদরের মতো মুড়ি দেয়া। নাকে এসে লাগে লাশের গন্ধ। অদ্ভুত নীরবতা কাঁপিয়ে লাশটা হঠাৎ খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে ওঠে প্রেতাত্মার মতো।

আবার বলে– 'ওস্তাদ, আমারে কই লইয়া যান'?

এরপর আর স্থির থাকা সম্ভব নয়। স্টিয়ারিংএ হাত। গাড়িতে স্টার্ট। যে কোনো কারণেই হোক গাড়ি স্টার্ট নেয় না। গাড়িটাও যেন লাশ হয়ে গেছে। স্থির। নিস্তব্ধ। পেছনে লাশের খ্যাঁকখ্যাঁক হাসি। তিন-চারবার চেষ্টার পর গাড়ি স্টার্ট নিল। রাস্তা ছিল একেবারেই ফাঁকা। ডানে-বামে না তাকিয়ে ফুল স্পিডে গাড়ি দিল টান। সামনেই ছিল এক কালবার্ট। রাস্তা থেকে সামান্য উঁচু। সেটায় বেধে বেবিট্যাক্সিটা হঠাৎ ক্যাঙারুর মতো একটা লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে মাটিতে পড়ে আবার চলতে লাগল। পেছনে ধপ্ করে কিছু একটা পড়ে যাবার শব্দ হলো যেন। আর শোনা গেল আঃ করে অস্ফুট এক চিৎকার। হতে পারে মনের ভুল। ফিরেও তাকাল না কাসেম। গাড়ি চলে উল্কার বেগে।

রাত দু'টো নাগাদ গাড়ি জমা দেয়ার কথা। গ্যারেজ মিরপুর এক নম্বরে। চিড়িয়াখানা রোডে। কাছেই এক বস্তিতে থাকে কাসেম ড্রাইভার। এয়ারপোর্ট থেকে ভালো একটা ক্ষেপ পেয়েছিল শ্যামপুর। প্রথমে গরিমসি করছিল। আসতেই চায় নি। বিদেশি পার্টি। টাকার অঙ্কটা বেশ বড়ই ছিল। তাই রাজি হওয়া। পকেটটা বেশ ভারী। কিন্তু ফিরতে যা একটু দেরি হয়ে গেল। ওদিকে যা জ্যাম। ওখানেই রাত প্রায় একটা বেজে গেল। দু'টোর মধ্যে ফেরা সম্ভব নয়। গভীর রাত, এদিকের রাস্তা বেশ ফাঁকা– আড়াইটার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। বুড়িগঙ্গা সেতুর নিচ দিয়ে বেড়ি বাঁধের উপর দিয়ে সোজা পথ ধরল। রাস্তা মোটামুটি ফাঁকাই। তবুও বসিলা সেতু পর্যন্ত আসতেই রাত দু'টো বেজে গেল। আড়াইটার মধ্যে পৌঁছানো কঠিন হবে বলে মনে হয়। রাস্তাটা আবার মাঝে মাঝে এবড়ো-খেবড়ো। কুয়াশা খুব একটা নেই, মাঝারি ধরনের, কিন্তু শীতটা পড়েছে বেশ। মধ্য জানুয়ারির শীত। কানে-মাথায় মাফলার জড়ানো। গাড়ি ছুটছে যতটা দ্রুত সম্ভব।

মেজাজটা বেশ ভালোই ছিল কাসেমের। কনকনে শীতটাকেও তার ফুরফুরে লাগছিল। বহুদিন পরে আজ ভালো একটা দাও পাওয়া গেছে। বাচ্চা দু'টোর জন্য দু'টো ভালো সোয়েটার কিনতে হবে। একটা ইলিশ মাছ। বহুদিন ইলিশ খাওয়া হয় না। ইলিশ ভাঁজার কোনো গন্ধ ওঠে না কখনও তাদের পাড়ায়। গরিব ছোটলোকদের বাস এ বস্তিতে। শ্রমিক রিক্সাওয়ালা গার্মেন্টসকর্মী ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা থাকে এ পাড়ায়। গু-মুত আর নর্দমার গন্ধ চারদিকে। তা ছাপিয়ে রান্নার গন্ধও বেরয়। তবে সুমিষ্ট নয়। মাছের গন্ধ পাওয়া গেলেও বোঝা যায় তা পচা মাছের। এসব ভাবতে ভাবতে ইলিশ ভাঁজার গন্ধ এসে লাগে তার নাকে। টের পায় খুন্তির শব্দ। বৌয়ের হাসিমাখা মুখটা ভেসে ওঠে মনে। মনে মনে গুনগুন একটা সুরও ভাঁজতে থাকে খুশিতে– পেয়ার কিয়াতো ডর্ না কিয়া।

কোনো এক অচেনা শহরের রাস্তা যেন কুয়াশার কাফনে মোড়া। রহস্যময়। স্বপ্নের মতো লাগে। দু'ধারে দৈত্যের মতো অজস্র কালো কালো অট্টালিকার সারি। দু'একটা ঘরে বাতি। আর সব আলোহীন। অন্ধকার। মৃত শহর। প্রেতের শহর। এত ফাঁকা যে, মনে হয় সরকার যেন রাস্তাটা তার একার জন্যই বানিয়ে রেখেছে। ব্যাক্তিগত রাস্তা। এরকম হলে ভালোই হতো। ফাঁকা রাস্তাটাকে মনে হচ্ছিল বিশাল কালো এক পাইথন। দিগন্ত জুড়ে পড়ে আছে নীরব, নিথর, মৃত, শীতল। কখনও আড়মোড়া ভেঙে জাগবে না। চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। আর তার পিঠের উপর দিয়ে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে কত কত লোক, কত কত গাড়ি। কত মিছিল। মৃত পাইথন কোনো প্রতিবাদ করে না। মনটা কেমন ভাবুক ভাবুক হয়ে ওঠে। ভাবতে ভালোই লাগছিল তার। কিন্তু তাল কেটে গেল। গান থেমে গেল।

হঠাৎ যেনবা ভোজবাজির মতোই সেই পাইথনের পিঠ ফুঁড়ে বেরুল জ্যান্ত দু'জন মানুষ। সামনে এসে দাঁড়াল কালো বোরকা পরা এক মহিলা এবং কিম্ভুত-কিমাকার চেহারার মধ্য বয়েসি দাড়িমুখো এক লোক। আচমকা তাদের দেখে কাসেম কিছুটা ভড়কে গেল। তার বুকটা ধড়াস করে উঠল। হাত তুলে তারা গাড়ি থামানোর ইশারা করল। কাসেম গরজ দেখাল না। তারা নাছোড়বান্দা। হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার মাঝখানে। তাদের গাড়িতে তুলে নেয়ার জন্য বেশ কাকুতি মিনতি করছে। প্রথমে গাড়ি থামাতেই চায় নি কাসেম। কিন্তু পথ ছাড়ে না তারা। খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার মাঝখানে। অগত্যা না থামিয়ে কোনো উপায় থাকে না।

গাড়ি থামাল। তারা কাসেমের গাড়িতে যেতে চায়। কাসেম জানাল কোনোমতেই সে তাদের নিতে পারবে না, গাড়ি জমা দেয়ার সময় পার হয়ে গেছে। মিরপুর এক নম্বরে তার গ্যারেজ। অতএব তাদের নেয়ার কোনো কায়দা নাই। চোখের জল ফেলে লোকটা আর মহিলাটা অনুনয় বিনয় করছে যে তারাও মিরপুর যাবে। মাজার রোডে। কাছাকাছি কোথাও নামিয়ে দিলেই যেতে পারবে। তাও যদি সম্ভব না হয়, পথে যে কোনো জায়গায় নামিয়ে দিলেই চলবে। তারা খুব বিপদে পড়েছে। ঢাকা মেডিকেল থেকে আসছে। এত রাতে তারা কী ভাবে এই শীতের মধ্যে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে? যাবেইবা কী ভাবে? ড্রাইভারের কি কোনো দয়ামায়া নাই? সে কি মানুষ না? মানুষইতো মানুষের পাশে দাঁড়ায় বিপদের সময়? এই সব বলছে আর করুণ মিনতি করছে।

কাসেমের মনটা আর্দ্র হলো। পাথরতো নয়, সে মানুষতো। দয়ার উদ্রেক হলো। কথায় বলে– কথায় চিড়ে ভেজে। রাজি হলো তুলে নিতে। গাড়ির পিছনের দরজাটা খুলে দিয়ে বলল– আইচ্ছা, উইট্টা বসেন। দেরি তো অইছেই। কী আর করা? কাসেম চেক করে দেখছিল অকটেন কতটুকু আছে। তারপর ফিরে তাকাতেই দেখে দু'জনে সাদা কাপড়ে প্যাঁচানো কী একটা ধরাধরি করে তুলছে। ভারি। লাশের মতো। বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ওটা কী? কোথায় ছিল? এতক্ষণ তো সে খেয়ালই করে নি এসব। আশ্চর্য কাণ্ড!

কাসেম বলল– ওটা কী?

মহিলাটা জবাব দিল– আমার পোলা।

– সাদা কাপড়ে প্যাঁচানো ক্যান?

– হাসপাতালে মারা গেছে। আইজই। রাত্তিরে।

কাসেম তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে– লাশ! লাশ আমি নেবো না। কোনোমতেই সম্ভব না। নামেন, নামেন আপনারা। আগে তো কন নাই লাশ আছে?

লোকটা বলে– কইলাম না ঢাকা মেডিকেল থেইক্যা আইছি?

– কিন্তু লাশ আছে তাতো কন নাই?

– কইছি না যে খুব বিপদে পড়ছি? এই মড়া পোলাডার জন্যেইতো বিপদ। এই দ্যাহেন হাসপাতালের ডেথ সার্টিফিকেট। আইজই একটু আগে মারা গ্যাছে।

এই বলে কাছে এগিয়ে এসে ডেথ সার্টিফিকেটটা কাসেমের চোখের সামনে মেলে ধরল। কাসেম চোখের দেখা দেখল। কিন্তু পড়ার ধৈর্য বা মানসিকতা তার ছিল না। আর থাকলেও ওই আবছা আলোতে পড়া সম্ভব ছিল

না। তাই ওতে কী লেখা রয়েছে, তা সে জানল না। কালো কালো অক্ষরগুলো মৃত ছেলেটার মতো মৃতই থেকে গেল। চোখে বা মনে তা কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল না। ধরেই নিল যে ওটা ডেথ সার্টিফিকেটই। আর তা হতেও পারে। ও নিয়ে কাসেমের মনে কোনো সন্দেহ, শঙ্কা বা উদ্বেগ জাগল না। দয়াও হলো না। ইতোমধ্যে গাড়িতে উঠে গেছে তারা।

– অসম্ভব। লাশ আমি নেবো না। নামেন আপনারা গাড়িত্থোন।

কিন্তু ততক্ষণে মাঝখানে লাশটাকে রেখে দু'পাশে দু'জন বেশ আয়েশ করে বসে গেছে নিশ্চিন্ত মনে। স্বেচ্ছায় না নামলে কোনোভাবেই তাদের নামানো সম্ভব নয়। অবশ্য মহিলাটা এবং লোকটার গলায় যে আকুতি ছিল এখন তা বুদ্বুদের মতো উধাও। বরং তার বদলে একটু ধমকের সুর এসে লেগেছে গলায়। কিছুটা হুকুমের আভাসও যেন। কিছুক্ষণ বাক-বিতণ্ডা হলো। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। কাসেম দেখল এরা নামবে না, শেকড় গেড়ে বসেছে। দেরি করলে আরও বিপদ। মেজাজটাই বিগড়ে গেল কাসেমের। মন থেকে উধাও ইলিশ মাছের গন্ধ। চৈতন্য জুড়ে এবার লাশের গন্ধ। অগত্যা গাড়িতে টান দিল। এর আগে কখনও এত একা হয়ে পড়ে নি রাস্তায়। মনটা কু গাইছে।

এরই মধ্যে লোকটা বলে ওঠে– ভাই বিপদ-আপদতো মানুষেরই অয়? আপনারে ঠকাব না। পয়সা যা ন্যান, দেব। গলাটা মোলায়েম। এবার একটু কোমল কাকুতি। কাসেম ভাবে– কী আর করা, উপায় তো নাই? বরং কয়ডা ট্যাকা বেশি পাইলে দারোয়ানডারে ঘুস দিয়া গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করা যাবে। বউডার জন্যেও একটা সোয়েটার কেনা যাবে নে। কিন্তু মনে তার আগের সেই ফুরফুরে ভাবটা নাই। গলায় আটকে থাকা আলপিনের মতো কেমন খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল অজানা এক উৎকণ্ঠা আর আতঙ্ক। বুকের মধ্যে কে যেন একটা পেরেক ঢুকিয়ে দিয়েছে তার। গাড়ি চলছে আনমনে। মোহাম্মদপুর বাঁশবেড়িয়া ছাড়িয়ে কিছুটা সামনে আসার পর হঠাৎ লোকটা বলে– ভাই একটু রাখেন, রাখেন। ওই বিল্ডিংয়ে আমার এক আত্মীয়র বাসা। এই যাব আর আসব। বড়জোর পাঁচ মিনিট। খবরটা একটু দিয়া যাই। মোবাইলে চার্জ নাই। খবরটা জানাতে পারি নাই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়ি থামাল কাসেম। লোকটা নেমে দরজাটা খোলা রেখেই চলে গেল দ্রুত। কিন্তু পাঁচ মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট, পনেরো মিনিট পার হয়ে গেল, তার কোনো দেখা নাই। এ কী গ্যাঁড়াকল? ভিতরে ভিতরে খুব অসহিষ্ণু হয়ে পড়ল কাসেম। কণ্ঠস্বরে কর্কশতা। কিন্তু উপায় কী? মহিলাটার কণ্ঠেও অসহিষ্ণুতা। বলল– বুঝতে তো পারছি না দেরি করতাছে ক্যান? খাড়ান, আমি এট্টু গিয়া দেহি। এই বলে মহিলাটাও দরজা খুলে দ্রুত হাঁটা শুরু করল।

কাসেম কী করবে বুঝে উঠতে না উঠতে মহিলা বেশ খানিকটা পথ হেঁটে গেল। গাড়ির মধ্যে লাশটা শুইয়ে রেখে গেছে। পিছন ফিরে লাশটাকে একটু দেখে নিল কাসেম। লাশটাতো লাশের মতো পড়ে আছে, এদিকে কাসেমের অবস্থা সাড়ে চৌষট্টি। এর আগে কোনো লাশের সাথে কখনও একা একা এভাবে থাকে নি। একা একা কেমন ভয়ভয় করতে লাগল। এ কী বিপদরে বাবা! রাত গভীরে ফাঁকা রাস্তায় অচেনা লাশের সাথে একা একা থাকটা যে কতটা ভয়ঙ্কর, কাসেম তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। বুকটা ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করছে। পানি তেষ্টা পাচ্ছিল। লাশের গায়ের ঠাণ্ডা যেন তাকে ছোঁয়। জড়িয়ে ধরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। একবার মনে হলো লাশটা যেন একটু নড়েও উঠল। ভাবল মনের ভুল। ভয় পেলে নিজের চুলকেও মনে হয় তালগাছ। কিন্তু আতঙ্কটা তাকে ছাড়ে না। আরও জড়িয়ে ধরে নিবিড় করে। সাহস সঞ্চয়ের জন্য এ কথা সে কথা ভাবতে শুরু করে। গান ধরতে চেষ্টা করে। কণ্ঠ কেঁপে কেঁপে যায়। নিজেই নিজের কণ্ঠস্বরে আঁৎকে ওঠে। থাক বাবা দরকার নাই গানের।

গোদের উপর বিষফোঁড়া। মহিলারও ফেরার কোনো নাম-গন্ধ নাই। গেছে তো গেছে। অগস্ত্য যাত্রা। এখন সে কী করে? লাশটা কি ফেলে রেখে যাবে? কী ভাবে ফেলবে? কে ধরবে ওই লাশ? ধরতেও তো ভয়! গাড়ির মধ্যে লাশ রেখে চালিয়ে যাওয়াও তো বিপদের। কোথায় নিয়ে যাবে এ লাশ? কী করবে? পথে টহল-পুলিশে ধরতে পারে। পুলিশ কেস হয়ে যাবে তাহলে। সে এক হাঙ্গামা। পিটিয়ে খগেন করে দেবে। তাকে খুনি

সাজিয়ে ফাঁসিতে লটকাবে। পত্রিকার খবর হয়ে যাবে সে। বৌ বিধবা হবে। ছেলে-মেয়ে দু'টো ভিক্ষুক হয়ে যাবে, ভাঙা থালা নিয়ে বসবে মিরপুর মাজার রোডে। উঃ আর ভাবা যায় না। আর চিন্তা করতে পারে না কাসেম। লাশ থাকলেও বিপদ, ফেলতেও বিপদ। দিল্লি কা লাড্ডু। উভয় সঙ্কট। সঙ্কট যেন শাঁখের করাত হয়ে কাসেমকে কাটে। দু'দিক থেকে। মহা বিপদে পড়েছে সে। কার মুখ দেখে আজ ঘুম ভেঙেছে কে জানে? চোখে যখন অন্ধকার দেখছে, হাত-পা অবশ হয়ে আসছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হবার অবস্থা হয়েছে, চোখে ঝিমুনি এসেছে, লাশটা তখন বলে ওঠে– 'ওস্তাদ, আমারে কই লইয়া যান'?

ততক্ষণে উঠে বসেছে লাশ। কাসেমের ভিরমি খাবার যোগাড়। এ কি স্বপ্ন না সত্যি? লাশ কথা বলে। হাতের কাছে নড়েচড়ে। ভৌতিক ব্যাপার। মনে হয় জ্যান্তর চেয়ে মৃতই ভালো ছিল। লাশটাকে এত ভয় লাগে নি এতক্ষণ। বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছে এখন। এ তো লাশের চেয়ে ভয়ঙ্কর। এখন সে কী করে? ভয়ে জিভ বেরিয়ে আসতে চায়। গলায় শুকনো ছাতু আটকে যাবার অবস্থা। দম বন্ধ হবার কায়দা। চোখে অন্ধকার দেখে। রাস্তাটা ধোঁয়ায় ঢাকা, খুঁজে পায় না। দিকদিশা না পেয়ে গাড়িতে স্টার্ট। এরপরই গাড়ি ছোটাল তীব্র বেগে, বেদম জোরে। গাড়ির গ্রিলের আকৃতির দু'পাশের দু'টো দরজা খোলাই ছিল। পাখির পাখার মতো তা খোলে আর বন্ধ হয়। বন্ধ হয় আর খোলে। আর ঠাস্ ঠাস্ শব্দ হয়। সে শব্দও যেন ঠাস্ ঠাস্ তার গালে চড় মারে। সামনে ছাড়া আর কোনো দিকেই তার দৃষ্টি নেই। পেছনে কী হচ্ছে, কী হতে চলেছে, কী হবে– ভাববার বা দেখবার তার কোনো অবকাশ নেই। সে জানে না এর শেষ কোথায়। জানার দরকারও নেই। উদ্দেশ্য একটাই– যে করেই হোক তার গ্যারেজে পৌঁছনো চাইই। কাসেম ছোটে। প্রাণভয়ে। গাড়ির স্পিড কত তাও জানে না সে। উল্কার মতো ছোটে।

কাসেমের পথ যেন আর ফুরোয় না। শেষ হয় না চলা। চলছে তো চলছেই। মাইলের পর মাইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যেনবা অনন্তকাল। মহাকাল জুড়ে তার চলা। মৃত পাইথনের পিঠ বেয়ে কাসেমের গাড়ি জীবিত লাশের হাত থেকে পালাতে চায়। আর কোনো খেয়াল নেই তার। গ্যারেজ অভিমুখে ছোটাই যেন তার একমাত্র কাজ। কাসেম কি আর জানে, এ গাড়ির গ্যারেজ কোথায়? কতদূর?

এত শীতেও ঘেমে ওঠে কাসেম। সহস্র কণ্ঠে লাশটা খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসে আর বলে– 'ওস্তাদ, আমারে কই লইয়া যান'? সামনে পেছনে ডানে বাঁয়ে কিছুই দেখে না সে। অন্ধের মতো গাড়ি চালায়। ট্যাক্সি-ড্রাইভারের ছেলে ট্যাক্সি-ড্রাইভার সে, গাড়ি চলানোই যেন তার ধর্ম। ব্রেক ফেল করা গাড়ির মতো কাসেমের গাড়ি চলে। সামনে দূরে চোখ যেতেই কাসেমের চক্ষু ছানাবড়া। ভয়ঙ্কর কিছু একটা দেখে হৃৎপিণ্ড বন্ধ হবার যোগাড়। হায় কপাল! স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে কাসেম দু'হাতে চোখমুখ ঢাকে। মৃত বাবার রক্তাক্ত নিশ্চেতন বিকৃত মুখটা তার চোখের সামনে ভাসে।